দ্বিতীয় অধ্যায়

অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাস : দেশভাগ-সমকালে মানুষের জীবনসংগ্রাম ও জীবনান্বেষণ

এক.

কথাসাহিত্যিক অতীন বন্দ্যোপাধ্যায় মনে করেন : "উপন্যাস লেখা উচিত লেখকের নিজের জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে, কারণ একটা জীবনেই উপন্যাসের মতো মালমশলা আছে, ব্যবহার করতে জানলে তাই যথেষ্ট।"[১] ছিন্নমূল জীবনের বেদনা ও অভিজ্ঞতার কথা তিনি কখনোই বিস্মৃত হন না। সম্প্রতি একটি সাক্ষাৎকারেও তিনি তাঁর জীবনের সেই ছিন্নমূল হওয়ার বেদনাকে উগ্‌ড়ে দিয়েছেন : "দেশভাগ হতেই চলে এসেছি — ছিন্নমূল আমরা।"[২] জীবন-অভিজ্ঞতার বাইরে গিয়ে কোনো প্রকার কষ্ট-কল্পনার দ্বারা উপন্যাস রচনা করা যে লেখক অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের একেবারেই পছন্দ নয় — একথা বলাই বাহুল্য। তাই দেশকাল-সংলগ্ন চেনা মানুষেরাই তাঁর উপন্যাসের চরিত্র হয়ে ওঠে। এজন্যই তাঁর উপন্যাসে অবলীলায় মিশ্রিত হয় আত্মজৈবনিক উপাদান। কেননা তিনি যে সকল মানুষের কথা, যে জীবনের কথা উপন্যাসে তুলে ধরেন তা নিশ্চিত রূপে তাঁর জীবন-অভিজ্ঞতার পরিধি থেকেই আহৃত। উপন্যাসে তিনি দেশকাল-সংলগ্ন যে জীবন প্রবাহের কথা বলেন, পক্ষান্তরে তাই হয়ে ওঠে মানুষের অখণ্ড জীবনের নিরন্তর সংগ্রাম ও অন্বেষণের বাণীরূপ।

দুই.

১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে দেশভাগ ও স্বাধীনতাকে দুই বাংলার মানুষের জীবনে ঔপনিবেশিক শাসনের চরম আঘাত রূপে গণ্য করা যেতে পারে। ধর্মের নামে দেশভাগের বীজ বাংলার রাজনৈতিক তথা আর্থসামাজিক পরিস্থিতির ভূমিতেই সুপ্ত ছিল। বিগত শতাব্দীর তিরিশের দশকে বা তার সামান্য পূর্ববর্তীকালে সেই বীজ অঙ্কুরিত হতে শুরু করে। ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দে মুসলিম লীগ যে চৌদ্দ দফা দাবি প্রস্তাব করেছিল তাতে মুসলিম লীগ মুসলমান অধ্যুষিত ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, সিন্ধু, বালুচিস্তান, পাঞ্জাব ও বাংলায় মুসলমানদের জন্য পৃথক রাজনৈতিক সত্তার স্বীকৃতি চেয়েছিল। ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দে মুসলিম লীগের এলাহাবাদ অধিবেশনে মহম্মদ ইক্‌বাল উত্তর-পশ্চিম ভারত অঞ্চলে একটি সুসংহত স্বতন্ত্র মুসলিম রাষ্ট্রের

দাবি উত্থাপন করেছিলেন। কিছুদিন পর মহম্মদ ইক্‌বাল লন্ডনের 'টাইম এন্ড টাইড' পত্রিকায় (১৯ জানুয়ারি, ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দ) তাঁর কুখ্যাত দ্বিজাতি তত্ত্বটি প্রকাশ্যে ঘোষণা করেন।[৩] এর কিছুদিন পরই লাহোর অধিবেশনে (২৩ মার্চ, ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দ) মুসলিম লীগ মুসলমান-প্রধান অঞ্চলগুলিকে নিয়ে স্বাধীন রাজ্য গঠনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। মুসলিম লীগের এই লাহোর প্রস্তাব চল্লিশের দশকে ভারতবর্ষময় হিন্দু-মুসলিম সম্পর্কের দ্রুত অবনতি ঘটায়।

১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দ থেকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলে ভারতের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট দ্রুত পরিবর্তিত হতে থাকে। বিশ্বযুদ্ধের জন্য ব্রিটিশ সরকার ভারতবাসীর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করে। পরিবর্তে ব্রিটিশ সরকার যুদ্ধ শেষে ভারতবাসীর স্বায়ত্ব শাসনের অধিকার দানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। গান্ধিজি প্রমুখ কংগ্রেসের শীর্ষ নেতৃবৃন্দ সেই প্রস্তাব মেনে নিয়েছিলেন। কিন্তু বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর দেশত্যাগ ও আজাদ হিন্দ্ বাহিনীর কার্যকলাপে ভারতবাসীর কাছে কংগ্রেস প্রায় অপ্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠার পরিস্থিতি তৈরি হয়। সম্ভবত এই পরিস্থিতি এড়াতেই ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দে গান্ধিজির নেতৃত্বে কংগ্রেসের প্রথম সারির নেতারা 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনের ডাক দেন এবং অচিরেই কারারুদ্ধ হন। কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের কারাবরণে প্রকৃত লাভ হয়েছিল মুসলিম লীগের কারণ এই সময়ে গান্ধিজির অবর্তমানে মুসলিম লীগের নেতৃবৃন্দ ভারতবর্ষময় সাম্প্রদায়িকতার আগুন বাধাহীনভাবে ছড়িয়ে দিতে সমর্থ হয়। অন্যদিকে যুদ্ধ জয়ের জন্য মরিয়া ব্রিটিশ সরকারও এই সময় থেকেই লীগ-তোষণ নীতি অনুসরণ করে। ১৯৪৩ খ্রিস্টাব্দে বাংলার প্রধানমন্ত্রী ফজলুল হক মুসলিম লীগ থেকে বহিষ্কার হলে এবং কিছুদিনের মধ্যেই প্রধানমন্ত্রীত্ব থেকে অপসারিত হলে বাংলায় হিন্দু-মুসলিম সম্প্রীতির সামান্যতম সম্ভাবনাও অস্তমিত হয়।[৪]

বিশ্বযুদ্ধ সমাপ্ত হলে আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি ও ব্রিটেনের অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতির চাপে নবনির্বাচিত লেবার পার্টির প্রধানমন্ত্রী ক্লিমেন্ট এ্যাটলি ভারতবর্ষকে স্বায়ত্বশাসন দেওয়ার ইঙ্গিত দেন এবং তৎকালীন ভারতে নিযুক্ত বড়লাট ওয়াভেলকে দিয়ে অনতিবিলম্বে ভারতের স্বায়ত্বশাসনের কথা ঘোষণা করান। এর ফলেই ভারতের জাতীয় কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের মধ্যে ক্ষমতালাভের প্রতিযোগিতা শুরু হয়। এই ঘোষণার সমকালে মুসলিম লীগ ভারতবর্ষের মুসলমান জনগণের কাছে যথেষ্ট গ্রহণযোগ্য ছিল। তাই মহম্মদ ইক্‌বাল কথিত দ্বি-জাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে মহম্মদ আলি জিন্নাহ্ পৃথক মুসলিম রাজ্য গঠনে তৎপর হয়ে ওঠেন। সেই সময়ে নীতিগতভাবে কংগ্রেস ভারত-ভাগের বিরোধী ছিল। এই পরিস্থিতিতে স্বায়ত্বশাসন ঘোষণার

সময় তাই ওয়াভেল ভারতবাসীর কাছে শর্ত রেখেছিলেন যে, যে মুহূর্তে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ ঐক্যমতে পৌঁছাবে সেই মুহূর্তেই ব্রিটিশ সরকার ভারতবাসীকে স্বায়ত্বশাসন দেবে। পরিস্থিতি ক্রমে অবনতির দিকেই যেতে থাকে। ভারতবর্ষকে স্বায়ত্বশাসন দেওয়ার জন্য ১৪ মার্চ ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দে ক্যাবিনেট মিশন পাঠানোর কথা ঘোষণা করা হয়। ২৩ মার্চ ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দে স্ট্যাফোর্ড ক্রিপস্, পেথিক লরেন্স, এ. ভি. আলেকজান্ডার ভারতে আসেন। মিশনের পরিকল্পনায় নানারকম আপত্তি সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত কংগ্রেস ও লীগ মিশনের প্রস্তাবে সম্মতি জানায়। কিন্তু কার্যত মিশন ব্যর্থ হয়। মিশন ফিরে যাওয়ার এক মাসের মধ্যেই মুসলিম লীগ সরকারিভাবে মিশনের প্রস্তাবে অসম্মতি জানায় (২৯ জুলাই ১৯৪৬)। লক্ষ্য পূরণের জন্য ঐ দিনই মুসলিম লীগ ১৬ আগস্ট ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দ দিনটিকে 'Direct Action' বা 'প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবস' হিসেবে ঘোষণা করে। ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দের ১৬ আগস্ট তারিখে কলকাতা, পাঞ্জাব, নোয়াখালিতে বীভৎস দাঙ্গা শুরু হয়। স্বাধীনতার প্রাক্কালে হিন্দু-মুসলিম জনসমাজের সম্প্রীতি-বন্ধনের শেষ আশাটুকুও বিলীন হয়ে যায়। গান্ধিজি তখন কংগ্রেসের তরুণ নেতৃবৃন্দের কাছে প্রায় ব্রাত্য। ভারতবর্ষকে অখণ্ড রাখার চেষ্টারূপে গান্ধিজি মহম্মদ আলি জিন্নাহ্-কে প্রধানমন্ত্রীর আসন দেওয়ার কথাও বলেছিলেন। কিন্তু সবকিছু তখন গান্ধিজির প্রভাবের বাইরে। সুচতুর মাউন্টব্যাটেন নেহ্রু ও আলি জিন্নাহ্-র বিপরীত অবস্থানের পরিপ্রেক্ষিতে দেশভাগের পথেই অগ্রসর হন। এরই ফলশ্রুতিতে ভারতবাসী তথা বাঙালি জাতি দেশভাগ নামক মহাবিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়। দেশভাগের সমকাল মূলত এরকমই একটি রাজনৈতিক সমীকরণের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ও প্রভাবিত।

তিন.

অবিভক্ত বাংলাদেশ এবং বাঙালির ইতিহাস একদিক থেকে দেখতে গেলে মূলত ধর্মভিত্তিক ভেদাভেদের ইতিহাস। ধর্মভেদকে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করেই হিন্দু-বৌদ্ধযুগ থেকে শাসক-শ্রেণির মানুষ বাংলার সিংহভাগ মানুষকে শোষণ করেছে। বাংলার সেই আর্থসামাজিক ইতিহাসের ইঙ্গিত পাওয়া যায় — বাংলাদেশে বিভিন্ন সময়ে নানা দেব-দেবীর আবির্ভাব পূজা প্রচার আর সমন্বয়ের ধারা থেকে। বাংলায় এক একটি রাজশক্তির উত্থান-পতনের সঙ্গে সমান্তরালভাবে বাঙালির ধর্ম এবং আর্থসামাজিক জীবনের পরিবর্তন এসেছে। হিন্দু-বৌদ্ধ যুগের অবসানে শুরু হয়েছিল তুর্কী আমল অর্থাৎ ইসলামী শাসনকাল। সেই যুগেরও অবসান

হয়েছে ইংরেজ আগমনে। তারপর প্রায় দু'শো বছরের ইংরেজ শাসনের ফলে বাংলার মুসলমান জনগণ সামাজিক প্রতিপত্তি আর ক্ষমতার কেন্দ্র থেকে দূরে সরে গিয়েছে। ঔপনিবেশিক শাসনের এই পরিণতিতেই ভারতের স্বাধীনতার সঙ্গে ধর্মের ভিত্তিতে দেশভাগের সমীকরণটি ভাবা যেতে পারে।

স্বাধীনতার প্রাক্কালে বাংলার মুসলমান জনগণ আলাদা একটি দেশ পাওয়ার জন্য কেন এতটা মরিয়া হয়ে উঠেছিল তার কারণ খুঁজতে হয় ঔপনিবেশিক শাসনের মধ্যেই। বাংলায় ইসলাম ধর্মাবলম্বী সুলতান-নবাবদের শাসনকালে হিন্দুরা পদানতই ছিল এই ঐতিহাসিক সত্যকে অস্বীকার করা যায় না। ফলে, ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দে নবাবের পতনে হিন্দুরা তেমন অখুশি হয়নি। লর্ড ক্লাইভ প্রমুখ ইংরেজ প্রশাসকরা প্রথম থেকেই মুসলমানদের প্রতি অবিশ্বাসী ছিলেন। ইংরেজ শাসনকালে প্রথম থেকেই অবিশ্বাস ও বিদ্বেষের জন্য মুসলমানরা ক্রমে শিক্ষা-দীক্ষা এবং রাষ্ট্রক্ষমতার কেন্দ্র থেকে অপসৃত হয়ে যায়। এই পরিস্থিতির সুযোগ গ্রহণ করেছিল হিন্দুরা। কোম্পানীর শাসনকাল থেকেই বাঙালি হিন্দুরা ইংরেজি শিক্ষার প্রতি আকৃষ্ট হয়, তেমনি তারাই আবার কোম্পানীর শাসন কাঠামোর পরিপার্শ্বে থেকে আর্থিক সুবিধাগুলি অর্জন করতে থাকে। ১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে অনেক হিন্দু ব্যবসাদার ছোট বা বড় জমিদারে পরিণত হয়। ইংরেজ আমলে কলকাতার নব্যবাবু সম্প্রদায়ের সিংহভাগটাই আসলে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে উদ্ভূত জমিদার। এই জমিদারদের আশ্রয় করেই বহু মধ্য ও নিম্নবিত্ত বাঙালি কলকাতা মহানগরীতে জায়গা করে নিতে থাকে। এদেরই একাংশ ইংরেজ শাসকদের শাসনযন্ত্রের অঙ্গ হয়ে ওঠে। পাশ্চাত্য শিক্ষা সংস্কৃতিকে এই শ্রেণির মানুষেরাই আকণ্ঠ গ্রহণ করে। এভাবে ইংরেজ আমলের সূচনা লগ্ন থেকেই হিন্দু বাঙালি মুসলমান বাঙালির তুলনায় শিক্ষা-দীক্ষা আর আর্থিক স্বচ্ছলতায় অনেক বেশি অগ্রসর হয়। স্বাধীনতা ও দেশভাগের সমকালে তাই বাংলার আর্থসামাজিক সমীকরণটি হল — জমিদার, ঋণদাতা, বিচারক, উকিল — এরা মূলত হিন্দু এবং বিপরীত দিকে প্রজা, ঋণগ্রহীতা, বিচার প্রার্থীরা সিংহভাগই মুসলমান। জমির মালিক, ব্যবসাদার, বুদ্ধিজীবীরা হিন্দু, মুসলমানেরা ভূমিহীন জনমজুর বা ব্যবসায়ী নৌকার মাঝি। তবে বাংলাদেশে যে মুসলমান জমিদার ছিল না তা নয়, কিন্তু শোষণ-বঞ্চনার ক্ষেত্রে তারাও হিন্দু জমিদারের তুলনায় কোনো অংশে কম ছিল না। স্বাধীনতার প্রাক্কালের এই পরিস্থিতিকেই মৌলবাদী নেতারা ক্ষমতা দখলের সুযোগ হিসেবে ব্যবহার করে।

১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার পর তাতে মূলত মধ্যবিত্ত ও

উচ্চবিত্ত হিন্দুরা যোগদানে অধিক উৎসাহী ছিলেন। রাজনৈতিক শিবিরকে আশ্রয় করে হিন্দু-মুসলমানের বিভাজন রেখা স্পষ্ট হয়ে ওঠে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন (১৯০৫ খ্রিস্টাব্দ) শুরু হওয়ার এক বছর পর ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দে, যখন মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠা হয়। এভাবে বিংশ শতকের প্রথম দশক থেকে হিন্দু ও মুসলমান জনগণের দুটি প্রকাশ্য শিবিরাশ্রয়ী মনোভাব স্পষ্ট হতে থাকে। এতে ইন্ধন জুগিয়েছিল ইংরেজ শাসকদের 'ডিভাইড এন্ড রুল' পলিসি, জিন্নাহ্-র দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে মুসলিম লীগের তৎপরতা, সর্বোপরি হিন্দু-শিল্পপতি এবং হিন্দু মহাসভা। বাংলার সিংহভাগ অশিক্ষিত মুসলমান জনগোষ্ঠীকে মুসলিম লীগ অতি সহজেই তাদের ছত্রছায়ায় একত্রিত করতে সমর্থ হয়। ধর্মভীরু মুসলমান জনগোষ্ঠী দারিদ্র্যের কারণে এবং হিন্দু সমাজের অস্পৃশ্যতা নীতির জন্য সহজেই মুসলিম লীগের পতাকাতলে সমবেত হয়। অপরপক্ষে হিন্দু জমিদার ও তাদের আশ্রিত হিন্দু জনগোষ্ঠীও প্রতিপত্তি এবং ধর্ম হারাবার ভয়ে যূথবদ্ধ হয়। ফলে স্বাধীনতার প্রাক্কালে বাংলায় হিন্দু-মুসলিম সম্পর্কে চূড়ান্ত অবনতি ঘটে এবং বাংলার বিস্তীর্ণ অঞ্চলে দাঙ্গার পরিস্থিতি তৈরি হয়।

চার.

দেশভাগের সমকালীন মানুষের কথা অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রথম উপন্যাস 'সমুদ্র মানুষ'-এ আসেনি। উপন্যাসের প্রতিপাদ্য বিষয় সমুদ্র ও নাবিক জীবন। কিন্তু সমুদ্র ও নাবিক জীবন-কেন্দ্রিক এই উপন্যাসের বিষয়ও পুরোপুরি লেখকের স্বদেশ-স্বভূমি বিচ্ছিন্ন নয়। এই উপন্যাসেও স্বভূমি-বিচ্ছিন্ন দুই বঙ্গ সন্তানের অন্তরে দেশবাড়ির প্রতি বিচ্ছেদের বেদনার কথা শোনা যায়। স্বদেশ-বিচ্ছিন্ন দুই ভিন্ন ধর্মের মানুষ শেখর ও মোবারক ধর্মের কথা ভুলে যায়, বড়ো হয়ে ওঠে তাদের শেকড়হীনতার যন্ত্রণা।

'সমুদ্র মানুষ' (১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দ) লেখার পর দেশভাগের বিষয় নিয়ে উপন্যাস রচনার জন্য অতীন বন্দ্যোপাধ্যায় সচেষ্ট হয়ে উঠেছিলেন। তাই দেশভাগের বিষয়ে একটি ভাবী উপন্যাসের কথা মাথায় রেখেই তিনি বেশ কয়েকটি ছোট ও বড় গল্প লেখেন। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য গল্পগুলি ছিল — 'কালনেমি', 'হৃদয় একমাত্র বাহক', 'মাশুল' ইত্যাদি। তাঁর সেই ভাবী উপন্যাসটি ছিল 'নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে'। তাঁর সেই সুযোগ এসেছিল 'অমৃত' পত্রিকার মাধ্যমে। 'অমৃত' পত্রিকার সম্পাদক কবি মনীন্দ্র রায় তাঁকে সেই সুযোগ দিয়েছিলেন। সম্প্রতি একটি সাক্ষাৎকারে লেখক অতীন বন্দ্যোপাধ্যায় 'নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে' উপন্যাস প্রকাশের

বৃত্তান্ত জানিয়েছেন : ‘‘মনীন্দ্র রায়কে বললাম, দেশভাগ বিষয় নিয়ে লিখতে চাই। কিছু গল্প লিখেছি ওই বিষয়কে নিয়ে — গল্পের ফর্ম-এ, উপন্যাসের অংশ বিশেষ মাথায় নিয়েই লিখেছি। মনীন্দ্র রায় বললেন, দেশভাগ নিয়ে তাহলে ধারাবাহিক লিখুন।... আমি বললাম, আগে একটা ধারাবাহিকের যে বিষয় ছিল সেই দেশভাগ। উনি বললেন, তাতে কিছু আসে যায় না। এরপর আমি একটা শর্ত দিলাম — আমার যে সব গল্প ইতিমধ্যেই প্রকাশিত হয়েছে তার পুনর্মুদ্রণ করতে হবে। কেননা ওই গল্পগুলি আমার প্রস্তাবিত ধারাবাহিক উপন্যাসের অংশবিশেষ। গল্পগুলির মধ্যে ছিল — ‘কালনেমি’, ‘হৃদয় একমাত্র বাহক’ (এই দুটি গল্প দেশ পত্রিকাতে বের হয়েছিল) আর হল — ‘মাশুল’ — ‘অমৃত’-তে প্রকাশিত হয়েছিল। সঙ্গে ছিল ‘কিংবদন্তীর সূর্য’ এবং আরো কিছু বড় গল্প।’’[৫] এরপর ‘অমৃত’ পত্রিকাতেই ১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দে ধারাবাহিকভাবে ‘নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে’ প্রকাশিত হতে থাকে এবং ১৯৭০ খ্রিস্টাব্দে তা সমাপ্ত হয়। উপন্যাসটি পরে ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে এপ্রিল মাসে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়।

অতীন বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর শৈশবে যে জীবনকে প্রত্যক্ষ করেছেন এবং কৈশোরের প্রাক্কালে যে জীবন থেকে তিনি বিচ্ছিন্ন হয়েছেন, সেই জীবনের কথা কখনই তিনি বিস্মৃত হন নি। তাই শৈশবের মানুষজন, সোনালী বালির নদী শীতলক্ষ্যা তাঁর উপন্যাসের বিষয় হয়ে ওঠে।

অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাবা, জেঠামশাইরা জমিদার বাড়িতে কাজ করতেন। যৌথ পরিবারের শাসন-শৃঙ্খলার মধ্যে তাঁর শৈশবের দিনগুলি অতিবাহিত হয়েছিল। বাল্যকালে তিনি পূর্ববঙ্গের গ্রামগুলির যে নিস্তরঙ্গ পরিবেশ দেখেছেন, হিন্দু-মুসলমানের যেরকম পারস্পরিক সৌহার্দ্য-সহাবস্থান দেখেছেন, তা-ই ক্রমে হিংসা-বিদ্বেষ এবং সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার শোণিত ক্ষেত্রে রূপান্তরিত হয়। এরই ফলে ঘটেছিল দেশভাগ, সৃষ্টি হয়েছিল তজ্জনিত উদ্বাস্তু সমস্যা। অতীন বন্দ্যোপাধ্যায় কৈশোর জীবনে সেই উদ্বাস্তু সমস্যার শিকার নিজেই হয়েছিলেন। জীবনের সেই কঠিন পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়ে অতীন বন্দ্যোপাধ্যায় শেষ পর্যন্ত যখন ঔপন্যাসিক রূপে আত্মপ্রকাশ করেন, তখন বাল্য-কৈশোর জীবনের অভিজ্ঞতাগুলি হয়ে ওঠে তাঁর উপন্যাসের প্রাথমিক উপাদান। ‘অমৃত’ পত্রিকার সৌজন্যে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত ‘নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে’ উপন্যাসে লেখক তাঁর বাল্য-কৈশোরে অতিক্রান্ত জীবন, পারিপার্শ্বিক পরিবেশ ও মানুষের কথাকে উপজীব্য করে তোলেন।

‘নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে’ উপন্যাসে লেখক তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিমায় রাজনৈতিক ও আর্থসামাজিক পটভূমি পরিবর্তনের ইঙ্গিত দিয়েছেন। উপন্যাসে ১৯৩৪-১৯৫২ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত

সময়কালকে ধরা হয়েছে। উপন্যাসে বর্ণিত সময়কালের তিন দশক আগে বাংলার মানুষ যেখানে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লর্ড কার্জনের বঙ্গভঙ্গ-পরিকল্পনা প্রতিরোধ করেছিলেন, সেই বাংলার মাটিতেই কীভাবে সবচেয়ে বেশি দাঙ্গা ও পরিণামে দেশভাগ নামক বিপর্যয় সংঘটিত হয়েছিল সেই উপলব্ধিকেই লেখক দেশভাগের আরও কয়েক দশক পর উপন্যাসের আধারে রূপায়িত করেছেন। লেখকের উপলব্ধিতে ধরা পড়ে — ধর্মাভিত্তিক দেশভাগে পশ্চাতে ক্রিয়াশীল ছিল আসলে দীর্ঘকালীন (ঔপনিবেশিক শাসনকাল) অর্থনৈতিক বঞ্চনার ইতিহাস। ঔপনিবেশিক শাসনজনিত কারণে উদ্ভূত আর্থসামাজিক কাঠামোয় গ্রামবাংলার সিংহভাগ ইসলাম ধর্মাবলম্বী মানুষ দারিদ্র্যের শিকার হয়েছিল। অর্থনৈতিক বঞ্চনার কারণে সবদিক থেকে উপেক্ষিত জনগণের যে ক্ষোভ জমে উঠেছিল সেই ক্ষোভের বারুদ-স্তূপে অগ্নি-সংযোগের সুযোগ নিয়েছিল মৌলবাদী নেতৃবৃন্দ। তার-ই ফল চল্লিশের দশকের হিংসার রাজনীতি এবং দেশভাগ। এরকমই একটি পরিবর্তনশীল রাজনৈতিক-সামাজিক সংকটের কালে অতীন বন্দ্যোপাধ্যায় দেখতে চেয়েছেন মানুষকে। লেখক স্বয়ং জানাচ্ছেন : "... উনসত্তর সালে 'নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে' শুরু হয়। সত্তরে শেষ করি। ... গ্রামের কথা, মাটির কথা, মানুষের কথা — এসব আমায় লিখতে হবে। দেশভাগ দেখেছি, বাড়িঘর ভাঙা দেখেছি, গাছপালা কেটে সাফ করা দেখেছি। চোখের সামনে সব শেষ হতে দেখেছি। আমার পাগল জেঠা, বাবা — তাঁর কথাবার্তা, আমার ওপার বাংলার প্রতিবেশীরা এই সবই আমার চরিত্র হয়ে উঠল। এইসব চরিত্র যে পরিবেশ থেকে উঠে এসেছে তার স্পষ্ট ছাপ আমার উপন্যাসে পড়েছে। অত্যন্ত পরিচিত প্রকৃতি থেকে লেখা 'নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে'। মানুষ যে প্রকৃতি আর পরিবেশে বড় হয় তার সঙ্গে তার একটা সহজাত বন্ধুত্ব তৈরি হয়। এটা যে কী তা তারাই বুঝবে যারা কোনো গ্রামে বড় হয়েছে। ... কৈশোরে দেশভাগ আমাকে খুব দুঃখ দিয়েছিল। ... আমি বার বার চেষ্টা করেছি নতুন করে কিছু দেখার। যে প্রকৃতির মধ্যে গোটা জীবনটাকে দেখেছি — মানুষের ঘরবাড়ি — তার জীবনযাপন, তাই লিখেছি। 'নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে'-র চরিত্ররা যেমন ঈশম শেখ, পাগল জেঠামশাই, জালালি — এরা সব আমার দেখা চরিত্র। আমি যে এদের মধ্যেই বড় হয়েছি। আমার বাবা, মেজজেঠা সত্যিই জমিদার বাড়িতে কাজ করতেন। আমি আমার এই উপন্যাসে একটা সামাজিক প্রাকৃতিক সম্পর্ককে ধরবার চেষ্টা করেছি। হিন্দু-মুসলমান বলে নয় — মানুষের সঙ্গে মানুষের যে সম্পর্ক সেই সম্পর্কের গভীরে যাওয়ার চেষ্টাই এখানে প্রধান।" [৬]

হিন্দু-মুসলমানের বিভেদ অথবা দেশভাগের বিভীষিকা দেখানো অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের

উদ্দেশ্য নয়। তিনি দেশভাগের সময়কালকে ব্যবহার করেছেন জীবনের আধার হিসেবে, আধেয় হল জীবনরস। চল্লিশের দশকের উত্তাল তরঙ্গমালায় অতীন দেখতে চেয়েছেন মানুষকে, যে মানুষগুলি সময়ের হলাহল আকণ্ঠ পান করে নীলকণ্ঠ হয়েছে। অতীন বন্দ্যোপাধ্যায় দেখাতে চেয়েছেন তাঁর দেশকাল সংলগ্ন মানুষগুলি কীভাবে ইতিহাসের সংকটকালেও জীবনের প্রবহমানতার ধারায় জীবন খোঁজে। মহাকালের মহাসংকটেও মানব মনের স্বাধীন ইচ্ছাপাখি আকাশ খোঁজে। মানুষের মৌল ইচ্ছাগুলি যেন নীলকণ্ঠ পাখি। মানুষ সেই ইচ্ছের দ্বারা তাড়িত। মানুষের সেই ইচ্ছেগুলি পূর্ণতা চায় — তার-ই জন্য মানুষের আবহমানকালের সংগ্রাম। কালের গতিতে বর্ণময় হয়ে ওঠে মানুষের সেই সংগ্রাম, বর্ণময় হয়ে ওঠে মানুষের জীবনান্বেষণ। 'নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে' — উপন্যাসে নানা স্তরের মানুষগুলি সেই সংগ্রাম ও অন্বেষণে লিপ্ত। মহাসংকটেও তাই মানুষের জীবনসংগ্রাম ও জীবনান্বেষণ অব্যাহত থাকে। মহাকালের কাছে মানুষের জীবন অতি সামান্য। একথা জেনেও মানুষ মহাকালের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে বেঁচে থাকতে চায়। লেখক অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ও সেই ধারণাই পোষণ করেন : ''আসলে মহাকালের প্রতিদ্বন্দ্বী নিজেকে ভাবতে ভালোবাসি। মানুষের ধর্মই যে এমন, সে মহাকালকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে বেঁচে থাকতে চায়। বেঁচে থাকতে চায় বলেই কাল কিংবা মহাকাল তাকে কিছুতেই হতাশ করতে পারে না।''[৭] অতীন বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর অতীত জীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে জীবনের এই সত্যকে উপলব্ধি করেছেন। এজন্যই অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাসে তাঁর আত্মজৈবনিক উপাদান অবলীলায় মিশে যায়। 'নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে' উপন্যাসটিও তার ব্যতিক্রম নয়। প্রকৃতপক্ষে, অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাল্য-কৈশোর, দেশভাগের সমকাল এবং 'নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে'-র জীবন ও সময়কাল পরস্পর সমান্তরাল। উপন্যাসের বাহ্যিক কাঠামোয় রয়েছে দেশভাগ-সমকালীন বিপর্যয়ের তরঙ্গমালা এবং অন্তঃপ্রকৃতিতে সঞ্চারিত হয়েছে লেখকের বিশিষ্ট জীবনচেতনা-ঋদ্ধ মানুষের জীবনসংগ্রাম ও জীবনান্বেষণের বিচিত্র রূপ। খণ্ডিত জীবন-সাধনা নয়, অখণ্ড জীবনকে মহাকালের প্রবহমান ধারায় উপলব্ধি করাই তাঁর প্রকৃত সাধনা। মহাকালকে প্রতিদ্বন্দ্বী ভেবে বেঁচে থাকবার ইচ্ছা আর ভালোবাসার জন্য মানুষের নিরন্তর সংগ্রাম ও অন্বেষণ — অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাসমালার অন্যতম প্রধান উপজীব্য বিষয়। 'নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে' উপন্যাসে জীবনের সেই বিচিত্র লীলা উপলব্ধি করা যায়। তাই লেখক বলেন : ''ভালোবাসলে মেঘ হয়, বৃষ্টি হয়, ভালোবাসলে মানুষ আরোগ্য লাভ করে। লিখতে লিখতে বার বার তা উপলব্ধি করেছি। এই উপমহাদেশের সংকট থেকে

পরিত্রাণ পাওয়ার একমাত্র উপায় মানুষের প্রতি ভালোবাসা। ভালোবাসলে সব দ্বিধা-দ্বন্দ্ব দূর হয়, ধর্ম সেখানে কোনো বাধাই সৃষ্টি করতে পারে না। লিখতে লিখতে তাও উপলব্ধি করেছি। না লিখলে এইসব বোধের আশ্চর্য লীলা অনুভবই করতে পারতাম না।"[৮] মহাকালের প্রতিদ্বন্দ্বী মানুষের কথা, মানুষের পারস্পরিক সম্পর্কের কথা, তাদের জীবনসংগ্রাম ও জীবনান্বেষণের কথা অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের সুদীর্ঘ উপন্যাসমালায় ঘুরে ফিরে আসে। 'নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে'-ও তার ব্যতিক্রম নয়।

পাঁচ

'নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে' উপন্যাটি 'অমৃত' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হতে থাকে ১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দে। তার কিছু পূর্বে 'অমৃত'-তেই দেশভাগের বিষয়ে প্রকাশিত হয় প্রফুল্ল রায়-এর 'কেয়াপাতার নৌকো'। একটি সাক্ষাৎকারে লেখক জানিয়েছেন : "উনসত্তর সালে 'নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে' শুরু হয়। সত্তরে শেষ করি। মনে পড়ছে আমার এই লেখার আগে গৌর কিশোর ঘোষ লিখেছিলেন 'জল পড়ে পাতা নড়ে'। তাতে পূর্ববঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গের লেখাগুলি আমাকে আপ্লুত করে। আমি ভাবলাম আমিও তো লিখতে পারি। যাঁরা আগে লিখেছিলেন তাঁদের মতো যেন আমার লেখা না হয়।"[৯] প্রকৃতপক্ষে সমকালীন ওই উপন্যাসগুলির সঙ্গে শুধু বিষয়গত সাদৃশ্য ছাড়া আর কোনো দিক থেকেই 'নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে'-র মিল নেই। 'নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে' অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবন মন্থনের ফল। এই উপন্যাস পাঠের প্রতিক্রিয়াস্বরূপ কথাসাহিত্যিক বিমল কর জানিয়েছেন : " 'নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে' অতীনের সেরা লেখা বলে অনেকেই মনে করেন। আমার নিজেরও মনে হয়, অতীনের এই লেখাটা যেন তার ভেতর থেকে উঠে এসেছে। আমরা যাকে বলি ভর-পাওয়া-লেখা। নীলকণ্ঠ হল তাই। এর মধ্যে অতীনের সত্তা ডুবে আছে।"[১০]

অতীন বন্দ্যোপাধ্যায় 'নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে' উপন্যাসে দেশভাগের সমকালকে উপন্যাসের আধার হিসেবে ব্যবহার করেছেন, দেশভাগের প্রস্তুতি ও দাঙ্গার কথা বলেছেন, দেশভাগের বিপর্যয়কেও উপন্যাসে স্থান দিয়েছেন কিন্তু তাঁর আসল অনুসন্ধানের বিষয় প্রবহমান জীবন। রাজনৈতিক ও আর্থসামাজিক পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে মানুষের জীবনসংগ্রাম ও অন্বেষণের সত্যস্বরূপই তাঁর অনুসন্ধানের মূল বিষয়। উপন্যাসের বিশাল ক্যানভাসে সমাজের নানা স্তরের বহু মানুষের সমাবেশ ঘটেছে। আপাতদৃষ্টিতে উপন্যাসের চরিত্রগুলির জীবনচর্যা ও আর্থসামাজিক

স্থিতি আলাদা। কিন্তু একটি ক্ষেত্রে মানুষগুলির মধ্যে আশ্চর্য মিল। সেই মিলটি হল — প্রতিটি মানুষ সমাজের বিবিধ স্তরে থাকা সত্ত্বেও নিরন্তর জীবন সংগ্রাম ও জীবনান্বেষণের শরিক। এই মানুষগুলি সমাজের নানা বিপর্যয়কে প্রতিহত করে কীভাবে জীবনের অখণ্ড ধারা প্রবাহকে অব্যাহত রেখেছে তাই উপন্যাসের অন্যতম উপজীব্য বিষয়। এই জীবন অনন্তকাল থেকে প্রবাহিত। ইতিহাস বিধৃত মহাসংকটেও তা স্তব্ধ হয় না। জীবনের এই ধারা অতীত থেকে বর্তমান, বর্তমান থেকে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের মধ্যেও ধীরে ধীরে সঞ্চারিত হয়। উপন্যাসের চরিত্রমালা — মহেন্দ্রনাথ, মণীন্দ্রনাথ, চন্দ্রনাথ, ঈশম, ফেলু, জব্বর, সামসুদ্দিন, মালতী, রঞ্জিত, জালালি, জোটন, ফকিরসাব, সোনা, ফতিমা — এরা প্রত্যেকেই জীবনের নানা স্তরে থেকে নিরন্তর সংগ্রাম ও অন্বেষণে রত। দাঙ্গার প্রস্তুতি থেকে শুরু করে দেশভাগের মত বিপর্যয় পর্যন্ত ঘটে যায়, মানুষ ধর্মভয়ে বা মান-সম্ভ্রম হারাবার ভয়ে ভিটে মাটি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়, মানুষের জীবন-জীবিকা, সামাজিক অবস্থান পরিবর্তিত হয়, রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির বদল ঘটে — কিন্তু মানুষের নিরন্তর সংগ্রাম ও অন্বেষণ অব্যাহত থাকে। 'নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে' — উপন্যাসে জীবনের এই সত্যই পরিস্ফুট হয়।

অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে' উপন্যাসের শুরুটা প্রায় আড়ম্বরহীন। কোনো এক হেমন্তের বিকেলে সোনালী বালির নদীর চরে রোদ হেলে পড়েছে। হাট থেকে ফিরছে গ্রামের হাটুরে। শান্ত নিস্তব্ধ গ্রাম। সেই বিকেলেই জন্ম নিচ্ছে ঠাকুরবাড়ির ধনকর্তার ছেলে। ছইয়ের নীচে বসে তামাক সেবনরত ঈশম শেখ, হাটুরে মানুষ, তরমুজের লতা, উড়ন্ত ফড়িং আর মাঠময় সোনালী ধানের গন্ধ এখানে প্রবহমান পুরাতন কালের প্রতীক হয়ে উঠেছে। অন্যদিকে ঠাকুরবাড়ির ছেলের জন্ম নতুন কালের সূচনাকেই দ্যোতিত করেছে। ঈশম শেখ নতুন কালকে স্বাগত জানাচ্ছে — "ধনকর্তার পোলা হইছে — বড় আনন্দ, বড় আনন্দ। সব খুদার মেহেরবানি।" [১১] আবার লেখক তৎক্ষণাৎ সেই নতুন কালের সন্ধিমুহূর্তকে মিলিয়ে দেন প্রবহমান কালের ধারায় : "সড়কের দু'ধারে ধান, শুধু ধান — কতদূরে এইসব ধানের জমি চলে গেছে। ঈশম চোখ তুলে দেখল সব। বিকেলের এই সব বিচিত্র রঙ দেখতে দেখতে তার মনে হল, পাশাপাশি এই সব গ্রাম তার কত চেনা, কতকালের মেমান সব — নিচে খাল, মাছেরা জলে লাফাচ্ছে।" [১২] জীবনের এই লীলা বহুপূর্বকাল থেকে নিরন্তর প্রবাহিত। হেমন্তের বিকেল মানে শীতকাল আগত-প্রায় কিন্তু জীবনের চলমানতায় কোনো ছেদ নেই। ধনকর্তার ছেলের জন্মমুহূর্তে সোনালী বালির নদীতে সূর্য ডুবে যাচ্ছে, হলদে রঙের ফড়িং ওড়াওড়ি

করছিল মাথার উপর, কচ্ছপেরা ধান গাছের অন্ধকারে ঘাপটি মেরে বসেছিল ডিম পাড়ার জন্য — জীবনের এই প্রবহমান লীলার বর্ণনা দিতে দিতেই অতীন বন্দ্যোপাধ্যায় 'নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে' উপন্যাসের প্রস্তুতি পর্বটি রচনা করেন। উপন্যাসের বিশাল ক্যানভাসে ভেসে ওঠা গাছপালা, পশুপাখি এবং মানুষগুলি অন্তহীন কালের স্মারক হয়ে ওঠে আবার সেইসঙ্গে অব্যাহত থাকে উপন্যাসে বর্ণিত মানুষগুলির জীবনসংগ্রাম ও জীবনান্বেষণের বিচিত্রলীলা। সময়ের পরিবর্তন ঘটে, আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক পটপরিবর্তন হয় কিন্তু মানুষের এই নিরন্তর সংগ্রাম ও অন্বেষণ অব্যাহত থাকে।

ঠাকুরবাড়ির বান্দা ঈশম শেখ। আল্লার প্রতি তার অগাধ বিশ্বাস। সে এক বিশ্বস্ত মানুষ। তার বিশ্বস্ততা আল্লার প্রতি, ঠাকুরবাড়ির মানুষগুলির প্রতি, গ্রামের সকলের কাছে অপাঙ্‌ক্তেয় ফেলুর প্রতি এবং বহুযত্নে লালিত প্রিয় তরমুজের খেতের প্রতি। ধর্ম বিশ্বাস তার কাছে কোনো বাধা নয়। মানুষ, ঈশ্বর এবং দেশের মাটির প্রতি বিশ্বস্ত থাকার জন্যই ঈশম শেখ-এর জীবনসংগ্রাম। ঠাকুরবাড়ির বড়কর্তার ছেলে জন্মানোয় সে আনন্দে আত্মহারা হয়। তাই ঈশম অন্ধকারের বুক চিরে তার ধনকর্তাকে খবর দিতে ছোটে। অতীতে সে ছিল গহনা নৌকার মাঝি, তার বর্তমান কাটে তরমুজের খেত পাহারায়। ঈশমকে তাই বলতে শোনা যায় : "আমি ঈশম শেখ। সাকিম টোডার বাগ।"[১৩] লেখক জানাচ্ছেন : "ঈশম যেন বলতে চাইল, আমি গয়না নৌকার মাঝি ছিলাম। এখন ঠাকুরবাড়ির খেয়ে মানুষ। অন্ধকার মানি না। বাবু ভদ্রলোকের সঙ্গে আমার বাস। নদীর চরে তরমুজ খেত পাহারায় থাকি। ঠাকুরবাড়ির বান্দা আমি। বয়স বাড়ছে, গয়না নৌকা চালাতে আর পারি না।"[১৪] একদা গহনা নৌকার মাঝি — এখন শুধু ফসলের পাহারায়। তার সম্বল শুধু হাতের লাঠি আর লণ্ঠনের মৃদু আলো, ভরসা একমাত্র আল্লা। ভূত-প্রেত জিন-পরী আর যাবতীয় মধ্যযুগীয় আদিভৌতিক বিশ্বাস তাকে ঘিরে রয়েছে। মাঠের অন্ধকারে ঘুরতে ঘুরতে দিশা হারিয়ে ফেললে তার মনে হয়েছে তাকে কানওলায় ধরেছে। বাবু ভদ্রলোকের বাড়িতে আশ্রিত বলে আত্মমর্যাদাবোধ করলেও রাতের অন্ধকারে ঈশমের অন্তরে লুকানো সংস্কারজাত ভয় জেগে ওঠে। কিন্তু মানুষের নিরন্তর সংগ্রাম ইচ্ছের তাড়নায় প্রবাহিত হয়। তাই ঈশম অন্ধকারের বাধা অতিক্রম করে ঠাকুরবাড়ির বিশ্বস্ত লোক হয়ে উঠতে চায়। সেই ইচ্ছের দ্বারা তাড়িত হয়েই সে রাতের অন্ধকারে ভূত-প্রেত জিন-পরী আর কানওয়ালার ভয়কে উপেক্ষা করে চন্দ্রনাথের কাছে ছুটে যাচ্ছিল তার ছেলের জন্মবার্তা নিয়ে। ঠাকুরবাড়ির সে কতবড় বান্দা তা-ই প্রমাণ করতে ঘরে পঙ্গু বিবি রেখে

তরমুজের খেত পাহারায় থাকে। সেই তরমুজের জমি তৈরি করবার জন্য ঈশম প্রাণপাত পরিশ্রম করেছিল। মাটি ও মানুষের লড়াইয়ে ঈশম জয়লাভ করে এবং সেই মাটিতে সোনার ফসল ফলায়। চৈত্রের দাবদাহে পথচলতি মানুষকে তরমুজ খাইয়ে ঈশম তার পরিশ্রমের সার্থকতা অনুভব করে। এভাবে ঈশম মাটির প্রতি তার ভালোবাসা ও বিশ্বস্ততার পরিচয় দেয়।

ঈশমের কাছে সব মানুষই ঈশ্বরের বা আল্লার বান্দা। আল্লার নেক বান্দা বলেই তার কাছে একটি হিন্দু পরিবারের মানুষজন যত আপন ততটাই আপন গ্রামের সকলের পরিত্যক্ত ফেলু। ষাঁড়ের সঙ্গে লড়াইয়ে মৃত ফেলুর দেহ কবরস্থ করবার ব্যাপারে সমস্ত গ্রামের মানুষ যখন স'রে দাঁড়ায়, তখন একমাত্র ঈশমই তাকে কবরস্থ করবার ব্যবস্থা করে। ফেলুর দেহ কবরস্থ করবার মধ্য দিয়ে ঈশম আল্লার প্রতি তার বিশ্বস্ততার পরিচয় দেয়। ঈশম ঠাকুরবাড়ির লোকজনের প্রতি যেমন বিশ্বস্ত, তেমনি তার বিশ্বস্ততার চূড়ান্ত পরিণতি রচিত হয়েছে তরমুজের খেতে মৃত্যুর মধ্য দিয়ে। তার এই মৃত্যু যেন সুজলা সুফলা বাংলা মায়ের প্রতি বিশ্বস্ততার আর একটি রূপ। পরাধীন ভারতবর্ষে ঈশম কখনও অনুভব করেনি সে ভূমিহীন মানুষ। স্বাধীনতা ও দেশভাগের ফলে ঈশমের তরমুজের খেতও হস্তান্তরিত হয়। ফলে, দেশভাগের পর ঈশম প্রথম ভূমিহীন হওয়ার বেদনা অনুভব করে। তরমুজের খেত তার প্রাণের চেয়ে প্রিয়। ঈশমের কাছে তা ছিল জিন-পরীর লীলাভূমি। তাই সেই পবিত্রভূমিকে সে ত্যাগ করতে পারেনি। ঈশমের সমস্ত অস্তিত্বের মধ্যে যে বিশ্বস্ততার বীজ তাকে আজীবন তাড়িত করেছিল — সেই বিশ্বস্ত থাকবার ইচ্ছে মৃত্যুর মধ্য দিয়ে অমরত্ব লাভ করে। ঠাকুরবাড়ির লোকজন ঈশমকে ছেড়ে চলে যায়, হাজিসাহেবের ছেলেরা তার তরমুজের খেত দখল করে নেয়, কিন্তু ঈশম তার প্রিয় তরমুজের খেতটি ত্যাগ করতে পারেনি। তরমুজের খেতেই ঈশম শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করে। মহাকালের স্রোতে মানুষ বিতাড়িত হয়, ছিন্নমূল হয়, মৃত্যুকে বরণ করে, কিন্তু তার মৌল ইচ্ছা এক স্বাধীন নীলকণ্ঠ পাখি। পার্থিব জীবনের সমস্ত হলাহল পান করেও মানুষের সেই মৌল ইচ্ছা অমরত্ব লাভ করে — মহাকালের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে ওঠে। ঈশমের জীবনসংগ্রাম ও জীবনান্বেষণ এই সত্যেরই অনুসারী।

উপন্যাসে মহেন্দ্রনাথ চরিত্রে জীবনের প্রতি গভীর মমতা এবং নিরন্তর এক সংগ্রামশীল মানসিকতার পরিচয় পাওয়া যায়। মহেন্দ্রনাথের বয়স শতবর্ষের কাছাকাছি। কিন্তু সেই জীবন ত্যাগ করতে তিনি কিছুতেই চান না। অশক্ত শরীরকে সকলের কাছে সুস্থ দেখাতে চান। পুত্র চন্দ্রনাথ তার পিতা মহেন্দ্রনাথের চন্দ্রায়ণের ব্যবস্থা করতে চাইলে তিনি জোর করে তার গলার

কাশি আটকে রাখেন। হাওয়ায় হাত দুলিয়ে পুত্রকে জানাতে চান তাঁর যাবার সময় হয়নি। জীবনে যত দুঃখই থাক না কেন, কেউ সে জীবন ত্যাগ করতে চায় না। জীবনের প্রতি এই গভীর ভালোবাসার কথা মহেন্দ্রনাথের মতই অন্যান্য চরিত্রেও বিদ্যমান। পৌত্রদের উপনয়নের কথা শুনে মহেন্দ্রনাথ খুশিতে উচ্ছল হয়ে ওঠেন। তিনি তাঁর পুত্রবধূর সন্তান সম্ভাবনার কথা শুনে পুনর্জন্মের কথা ভাবতে থাকেন। এক জীবনে ব্যর্থ হলেও তিনি আবার ফিরে আসতে চান চন্দ্রনাথের সন্তানরূপে। জীবন কখনও থেমে থাকে না। সেই অনন্ত জীবনচক্রে তিনি আবার ফিরে আসতে চান। জন্মান্তরবাদের এই সংস্কারগত ধারণা চন্দ্রনাথের মৃত্যুভয় দূরীভূত করে। প্রকৃপক্ষে, জীবনের প্রতি মানুষের এক গভীর মমতা ও ভালোবাসার কথাই লেখক এখানে পরিস্ফুট করতে চেয়েছেন।

অন্যদিকে মহেন্দ্রনাথের জীবনসংগ্রাম ও অন্বেষণের দিকটিকেও লেখক পরিস্ফুট করেছেন। মহেন্দ্রনাথ তাঁর সনাতন ধর্ম রক্ষার জন্য আজীবন সংগ্রাম করেছেন। ধর্ম রক্ষার জন্য তিনি জীবনে একবার মিথ্যার আশ্রয় নিয়েছেন। মহেন্দ্রনাথের বড় ছেলে মণীন্দ্রনাথ ভিন্ন ধর্মাবলম্বী বিদেশী পলিনকে ভালোবাসতেন। মহেন্দ্রনাথ মিথ্যা অসুস্থতার ছলনায় মণীন্দ্রনাথকে পলিনের কাছ থেকে সরিয়ে নিয়ে এসেছিলেন। মণীন্দ্রনাথ পিতৃ আজ্ঞা পালনের জন্য তার ভালোবাসাকে বিসর্জন দিয়ে উন্মাদ হয়ে যান। তারপর পুত্রের আরোগ্য কামনায় মহেন্দ্রনাথ যতদূর সম্ভব হেঁটে গেছেন : "যেমন তিনি জীবনে একবার মিথ্যা তার করে, সন্তানের ভালোবাসা কেড়ে নিয়েছিলেন, তেমনি তিনি প্রৌঢ় বয়সে প্রায় তাঁর ঈশ্বরের সঙ্গে হার জিতের বাজিতে পড়ে গিয়ে — যা কিছু অকল্পনীয়, যা কিছু মানুষের দ্বারা সিদ্ধ, ভূত অথবা পিশাচ কোনও কিছুই বাদ রাখেননি। যেন তিনি দৈবের সঙ্গে বোঝাপড়া করার জন্য ক্রোশের পর ক্রোশ নিশিথে হেঁটে যেতেন, কোনও ফকির অথবা আউলবাউলের উদ্দেশে।"[১৫] এই সংগ্রামী মানুষ মহেন্দ্রনাথ শেষ জীবনে অন্ধ হয়ে যান। কিন্তু এই অন্ধত্ব তাঁর জীবন পিপাসাকে নিঃশেষ করতে পারেনি। উপন্যাসে মহেন্দ্রনাথ ধর্মরক্ষার জন্য সব করতে পারেন। ধর্ম রক্ষার জন্য তিনি জ্যেষ্ঠ পুত্র মণীন্দ্রনাথের ভালোবাসাকে বলি দিতে পারেন, ধর্ম রক্ষার জন্য তিনি মিথ্যা বলতে পারেন, ধর্ম রক্ষার জন্য তিনি বড়বৌয়ের মানসিক যন্ত্রণা নীরবে সহ্য করতে পারেন, ধর্ম রক্ষার জন্য তিনি জীবনের যাবতীয় পরাজয়কে স্বীকার করতে পারেন। এভাবে ধর্ম রক্ষার জন্য তিনি কখনও চাঁদ সদাগর আর কখনও বা রামায়ণের দশরথের তুল্য হয়ে ওঠেন। মহেন্দ্রনাথ নামক জীবনযুদ্ধে হেরে যাওয়া মানুষটি হয়ে ওঠেন মহাকাব্যিক চরিত্র। দশরথ তার সত্য পালনের জন্য পুত্র-

বিয়োগ যন্ত্রণা মেনে নিয়েছিলেন। সেই শোকে তিনি মৃত্যুবরণ করেছিলেন। মহেন্দ্রনাথও শেষ পর্যন্ত শোক যন্ত্রণায় অন্ধ হয়ে যান। চাঁদ সদাগর তাঁর শৈব ধর্ম রক্ষার্থে মনসার সঙ্গে বিরোধিতায় সর্বস্ব খুইয়েছিলেন, পুত্রবধূর বৈধব্যের হাহাকারকে প্রত্যক্ষ করেছিলেন। মহেন্দ্রনাথও তেমনি নিজধর্ম রক্ষার্থে, রক্ষণশীলতাবশত মণীন্দ্রনাথকে পলিনের ভালোবাসা থেকে বঞ্চিত করেছিলেন। পিতৃসত্য রক্ষার্থে মণীন্দ্রনাথ জীবন যুদ্ধে পথ হারিয়ে ফেলেছে। বড়বৌয়ের মনে হয় তার স্বামী মণীন্দ্রনাথ গ্রীক পুরাণের বীর নায়ক মোজেস। ভালোবাসার সুখ পাখি শুধু মণীন্দ্রনাথের জীবন থেকেই হারিয়ে যায়নি, বড়বৌয়ের জীবনেও তার প্রভাব বিদ্যমান। বৃদ্ধ মহেন্দ্রনাথ, বড়বৌ, পরিবারের অন্যান্য সদস্য এমনকি গ্রামের সব মানুষই মণীন্দ্রনাথের জীবনের শোচনীয় পরাজয়ের দুঃখ বহন করে চলেছে। ব্যক্তির অপ্রাপ্তিতে এখানে সমগ্র সমাজ আক্রান্ত। মহেন্দ্রনাথের ধর্মবোধের গোঁড়ামিতে তাঁর প্রতিভাবান পুত্র উন্মাদ, পুত্রবধূ সারাজীবন বসে থাকে পাগল স্বামীর ঘরে ফেরার প্রতীক্ষায়। মহেন্দ্রনাথ চাঁদ সদাগরের সঙ্গে নিজেকেও তুলনীয় মনে করেন : "পদ্মপুরাণ তো আমি নিজেই। মাগো — সারাজীবন আমি চাঁদ সদাগরের পাঠ করছি, তুই বেহুলার।"[১৬] পাশের গ্রামে হামিদ ভাই, হাজিসাহেব — সবাই মণীন্দ্রনাথের দুঃখে সমব্যথী। রামচন্দ্র চৌদ্দ বছর পর অযোধ্যায় ফিরেছিলেন, কিন্তু মণীন্দ্রনাথ আর কখনই বাস্তব জীবনে ফেরেননি। মণীন্দ্রনাথের উন্মত্ততা রামচন্দ্রের চৌদ্দ বছর বনবাসের চেয়ে দীর্ঘতর এবং যন্ত্রণাময়। পাগল ঠাকুর মণীন্দ্রনাথ বাস্তব জীবনে কখনই ফিরে আসেননি এবং পরিবারের কাছে তার অন্তর্ধান রহস্য চিরকাল অধরাই থেকে যায়।

মহেন্দ্রনাথের বড় ছেলে মণীন্দ্রনাথ তাঁর পরিবার বা আশেপাশের মানুষগুলির সেই দুঃখের কথা জানেন না। তিনি শুধু নির্জনতা চান। সেই নির্জনতায় তিনি খোঁজেন পলিনের মুখ। তাঁর ইচ্ছার ঘরে শুধু পলিন। তাঁর কাছে মহাকাল স্তব্ধ হয়ে রয়েছে ১৯২৫-২৬ খ্রিস্টাব্দের সীমায়। সে কারণেই তিনি উন্মাদ। এই উন্মাদের কাছে মহাকালও পরাস্ত। তাঁর ইচ্ছা পাখি অমর হয়ে রয়েছে পলিনের দুটি চোখে। এভাবে পাগল ঠাকুর মণীন্দ্রনাথ মহাকালেরও প্রতিস্পর্ধী হয়ে ওঠেন। মহাকালের প্রবহমানতাকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে তিনি আজীবন শুধু পলিনের দুটি চোখে ভালোবাসার অন্বেষণ করে চলেছেন। তাঁর উন্মত্ততার মধ্যেও এই অন্বেষণ প্রক্রিয়া নিরন্তর চলতে থাকে।

পাগল ঠাকুর মণীন্দ্রনাথের জীবন থেকে সুখ-শান্তি-ভালোবাসা হারিয়ে যায়। পলিনের সঙ্গে বিচ্ছেদ যন্ত্রণায় মণীন্দ্রনাথ উন্মাদগ্রস্ত। ভালোবাসাতেই তো মানুষের যথার্থ মুক্তি। মণীন্দ্রনাথের

সেই ভালোবাসার প্রতীক নীলকণ্ঠ পাখি যেন হারিয়ে গেছে চিরতরে। মণীন্দ্রনাথের পিতা মহেন্দ্রনাথ সামাজিক তথা ধর্মীয় সংস্কারের প্রাচীর ভাঙতে পারেননি। হয়ত সেই সামাজিক সংস্কারের প্রাচীর মণীন্দ্রনাথও ভাঙতে পারেননি। সম্ভবত সে কারণেই তাঁর পাপ বোধ। ব্যক্তির ভালোবাসা এবং সামাজিকতার দ্বন্দ্বে বিকৃত মস্তিষ্কের অধিকারী মণীন্দ্রনাথ যাবতীয় অসংলগ্ন আচরণ করে চলেন। তাঁকে দেখলে মনে হয় রাতের অন্ধকারে তিনি সেই পাপের অন্বেষণ করে চলেছেন : "দেখলে মনে হবে মধ্যযুগীয় কোন নাইট রাতের অন্ধকারে পাপ অন্বেষণ করে বেড়াচ্ছেন।"[১৭] জীবন থেকে হারিয়ে যাওয়া হাজার হাজার নীলকণ্ঠ পাখির প্রতি তাঁর আহ্বান গ্রাম, মাঠ, সোনালী বালির চর পার হয়ে তরমুজের খেতে এসে ঝুলে থাকে, শুধু মাটিতে নামতে পারে না। নামবেই বা কী করে! জীবনের ধর্ম তো পশ্চাৎগতি নয় — পাপ-পুণ্য সব নিয়ে শুধু সামনের দিকেই সেই জীবন প্রবাহিত হতে পারে।

মণীন্দ্রনাথের ভালোবাসা-বঞ্চিত জীবন স্তব্ধ হয়ে যেতে পারে কিন্তু সোনা, লালটু, পলটু — এদের মধ্য দিয়ে জীবনের ধারা প্রবাহিত হয়ে চলে। জীবনের এই প্রবাহকে মণীন্দ্রনাথ বোধগম্য ভাষায় প্রকাশ করতে পারেন না, শুধু বলেন 'গ্যাৎচোরেৎশালা'। তাঁর এই আত্মপ্রকাশ ভঙ্গি দুর্বোধ্য হলেও লেখক মনে করেন : "মণীন্দ্রনাথের বড় ইচ্ছা, জীবনের হারানো সব নীলকণ্ঠ পাখিরা ফিরে এসে রাতের নির্জনতায় মিশে থাক —"[১৮] পাগল ঠাকুর মণীন্দ্রনাথের প্রতি উপন্যাসের প্রতিটি চরিত্র, এমনকি লেখকও সহমর্মী। ঈশম, আবেদালি, মনজুর এমনকি লীগের নেতা সামসুদ্দিনের মনেও পাগল ঠাকুরের প্রতি সহমর্মিতার পরিচয় পাওয়া যায়। আশেপাশের সমস্ত হিন্দু-মুসলিম গ্রামের মানুষ বড়কর্তা মণীন্দ্রনাথকে ঈশ্বরের সামিল মনে করে। মনজুর মণীন্দ্রনাথের নামে হাসান পীরের দরগায় সিন্নি চড়ায়। গ্রামের সব মানুষ এই রাজকীয় পুরুষের জন্য গৌরব বোধ করে। দেখা যায়, ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সকলেই মণীন্দ্রনাথের মানসিক যন্ত্রণার প্রতি সমব্যথী। দেশভাগের সমকালে সাধারণ মানুষের মধ্যে এই পারস্পরিক সৌহার্দ্য এভাবেই বিদ্যমান ছিল। পাগল ঠাকুরের প্রতি গ্রামের সমস্ত মানুষের আচরণেই তা প্রমাণিত। উপন্যাসের অন্যান্য মানুষগুলির মত পাগল ঠাকুর মণীন্দ্রনাথের মনেও এক সুপ্ত যন্ত্রণা। কীটসের কবিতা আবৃত্তি করে তিনি সেই যন্ত্রণার কথা সকলকে জানাতে চান। কিন্তু কেউ তাঁর যন্ত্রণার কথা বোঝে না। তাঁর যন্ত্রণার ভাবটুকু লেখক জানাচ্ছেন : "যেন এই পৃথিবী নিরন্তর অসহিষ্ণুতায় ভুগছে।"[১৯] পাগল ঠাকুর সেই অসহিষ্ণুতার কথা সকল মানুষকে জানাতে চান। এভাবে সময়ের গভীর অসুখের কথা সকলের কাছে জানাতে চান। পাগল ঠাকুর

যেন দেশভাগ সমকালের দর্পণ, যেখানে সমসাময়িকের যন্ত্রণার প্রতিচ্ছবি ভেসে ওঠে। 'নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে' — উপন্যাসে এভাবে পাগল ঠাকুর মণীন্দ্রনাথের চরিত্র তাৎপর্যময় হয়ে ওঠে। তিনি একদিকে যেমন দেশভাগ সমকালে পূর্ববঙ্গের আপামর জনতার সৌহার্দ্যপূর্ণ সহাবস্থানের শেষতম অবলম্বন, তেমনি তারই অব্যক্ত যন্ত্রণাবোধের মধ্যে আভাসিত হয় জনমানসের অসহিষ্ণুতার কথা।

পাগল ঠাকুর মণীন্দ্রনাথের দুর্ভাগ্যের সঙ্গে জড়িয়ে যায় তাঁর স্ত্রী বড়বৌয়ের জীবন। মণীন্দ্রনাথের জীবনে সবচেয়ে বড় বাঁধা বড়বৌ। বড়বৌয়ের উদাস অপেক্ষমান চোখ দুটি দেখলে তিনি হতাশ হয়ে যান। তখন শুধু এক অব্যক্ত বেদনা তাঁর চোখে মুখে ফুটে ওঠে। বড়বৌ এই পাগল মানুষটির জন্যই সবকিছু উজার করে দিতে পারে। সে এই পাগল স্বামীকে সুখী করতে চায়, কিন্তু তিনি তাঁর অতীত স্মৃতির জগতেই অবরুদ্ধ। এভাবে বড়বৌয়ের জীবনও মণীন্দ্রনাথের জীবনের সঙ্গে সঙ্গে চোরাবালিতে হারিয়ে গেছে। এই সত্য জানার পরও বড়বৌ এই পাগল মানুষটিকে সবকিছু উজার করে দিয়ে সুখী হতে চায় এবং পাগল মানুষটিকে সুখী করতে চায়। মণীন্দ্রনাথের সঙ্গে নৈশবিহারের সময় বড়বৌ অনুনয় করেছেন : "তুমি কী চাইছ বল! কী পেলে তুমি সুখী হবে বল, সব দিচ্ছি। আমি চলে যাব এ-দেশ ছেড়ে। আমি চলে গেলে তুমি সুখী হবে! বল তুমি? তুমি যা বলবে আমি তাই করব!" [২০] বড়বৌয়ের এই অনুনয়, এই আত্মত্যাগের আর্তির মর্ম পাগল মণীন্দ্রনাথ বোঝেন না। কিন্তু লেখক মণীন্দ্রনাথের হয়ে বড় বৌয়ের কথার পরিপ্রেক্ষিতে বলেন : "এভাবে কিছু হয় না। আমরা শেষ পর্যন্ত কিছু করতে পারি না। তবু হাঁটি। হেঁটে হেঁটে ক্লান্ত হই। মনে হয় সামনেই একটা সরাইখানা আছে। একটা অদৃশ্য সরাইখানার পিছনে সবাই আমরা ছুটছি। ... মাঠ কেউ পার হতে পারে না বড়বৌ। পার হব বলে সবাই বের হয়ে পড়ি। তারপর রাতদিন ক্রমান্বয়ে হাঁটা। হাঁটতে হাঁটতে ক্লান্ত বিষণ্ণ। ... মাঠ পার করে দিতে কেউ পারে না বড়বৌ। আমরা সবাই ইচ্ছা করলে শুধু তেষ্টার সময় জল দান করতে পারি। আর কিছু পারি না।" [২১] জীবন মানেই যে নিরন্তর পথ চলা, আদি অন্তহীন এক বিশাল মাঠ পেরিয়ে যাওয়ার সংগ্রাম — এই উপলব্ধির কথাই অতীন বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর সৃষ্ট চরিত্রগুলির মধ্য দিয়ে বলতে চেয়েছেন। লেখক তাঁর এই উপন্যাসে উপলব্ধি করেছেন, জন্মসূত্রে মানুষ জীবন নামক এক বিশাল মাঠ পার হবার জন্য নেমে পড়ে, শুধু হেঁটে যায়, সমাজ-সংস্কার-রাজনীতি তথা ব্যক্তিক সংকটে পড়ে ক্লান্ত হয়, বিষণ্ণতায় আক্রান্ত হয় তবু সে সেই মাঠ পার হতে পারে না, শুধু ক্লান্ত হয়ে পড়লে একে অপরকে জল দান করতে পারে

কারণ লেখক এও মনে করেন যে, জল মানেই জীবন এবং তা বিপুল সম্ভাবনাময়। অতীন বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর উপন্যাসে এভাবেই জীবন উপলব্ধির কথা বলেন। আদি অন্তহীন জীবনে মানুষ শুধু ভালোবাসার দ্বারা মরুদ্যান রচনা করতে পারে — মরীচিকার পেছনে ছোটার অর্থ ভ্রান্তি বাড়িয়ে তোলা। পাগল ঠাকুর যে মরীচিকার পেছনে ছুটেছেন তাকে তিনি ধরতে পারেন নি। বড়বৌ যতই রূপের ডালি নিয়ে সামনে দাঁড়িয়ে থাক না কেন তিনি তা দেখতে পান না। জীবনের অকূল সমুদ্রে যে জীবনতরী মণীন্দ্রনাথের সম্মুখে উপস্থিত তাতে তিনি উপবেশনের পথ খুঁজে পান না। অন্যদিকে বড়বৌ তার ভালোবাসার মানুষের কাছে পৌঁছাতে পারেন না। তিনি জীবনের শেষ পর্যন্ত অপেক্ষা করে থাকেন। তাঁর জীবনও নিরন্তর সংগ্রামের নামান্তর।

বড়বৌ তার পাগল স্বামীকে ভালো করে তোলার জন্য গভীর রাতে কখনো মাঠে নেমে যেতেন, কখনওবা রাত জেগে বসে থাকতেন। এভাবে অপেক্ষা করতে করতে বড়বৌ একদিন দেখলেন দেশে দাঙ্গার সূচনা হল। একদিকে মুসলমানদের 'আল্লা-হু-আকবর' ধ্বনি, অন্যদিকে হিন্দু যুবকেরা তখন একত্রিত হয়ে 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনি দিচ্ছে। ধর্মভীরু ঈশম তখন তার তরমুজের ক্ষেতে জিন-পরীর লীলা দেখে অবিভূত হচ্ছে। দেশে রাজনৈতিক পটপরিবর্তন হচ্ছে — এরই মধ্যে লেখক অঙ্কন করেন ব্যক্তি মানুষের আত্মিক সংকটকে।

দাঙ্গার জন্য নদীর চরে যে মুসলমান মানুষগুলি সমবেত হয়েছিল ফেলু তাদের একজন। নদীর চরে তখন চলছিল ১৪৪ ধারা। চর অতিক্রম করে এলেই পুলিশ গুলি চালায়। ফেলুর বাগী বাছুর ছুটে পালায় আর তার ডান হাতে পুলিশের গুলি এসে লাগে। ফেলুর নিজেকে মনে হয় হেরে যাওয়া মানুষ, অথচ সে হেরে যেতে চায় না। তার অপরাজেয় মানসিকতার কথা লেখক উপন্যাসে অঙ্কন করেছেন।

দাঙ্গার বর্ণনা দিতে গিয়ে লেখক তাঁর নিজস্ব উপলব্ধির কথা তুলে ধরেছেন। উপন্যাসে বর্ণিত আনন্দময়ী কালীবাড়ির পাশে কোনো এক পুরনো ভাঙা দুর্গের মত একটা ধ্বংসস্তূপকে মুসলমান মৌলবাদীরা বলে এককালে সেখানে নাকি মসজিদ ছিল। তাই তারা সাধারণ ধর্মভীরু মানুষকে ক্ষেপিয়ে তুলেছে, সেখানে নামাজ পড়তে হবে। স্বাভাবিকভাবে, কালীবাড়ির সংলগ্ন ভগ্নস্তূপের পাশে নামাজ পড়ার আয়োজন হিন্দুদের ধর্মচেতনাকে আঘাত করে। এভাবে দাঙ্গার সূচনা হয়। এই দাঙ্গার পশ্চাতে সমাজের কোন শ্রেণির মানুষের প্রভাব কীরকম তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে লেখকের বর্ণনায়। লেখক উদঘাটন করেছেন দাঙ্গার পশ্চাতে আসলে অমানবিক ধর্ম-চেতনাই দায়ি। দাঙ্গার মর্মান্তিক দৃশ্য সম্পর্কে লেখক বলেছেন : "মানুষের জন্য মানুষ, না

কোরবানীর জন্য মানুষ বোঝা যাচ্ছে না।" [২২]

দাঙ্গায় পুলিশের গুলিতে ফেলুর শুকনো বিকল হাতটি গুলিবিদ্ধ হয়ে ছিঁড়ে যায় আর সেই স্থানটা কুষ্ঠরোগের ক্ষতে পরিণত হয়। তবুও ফেলু হার মানতে নারাজ। ঘরে রয়েছে তার বিবি আন্নু। আন্নুকে সে পর্দার আড়ালে রাখতে চায়। রাস্তার মানুষ যাতে তার বিবির প্রতি দৃষ্টি দিতে না পারে সে জন্য ফেলু এক হাতেই বাড়িটা বেড়া দিয়ে ঘিরে রেখেছে। তার হাতের অবস্থার জন্য সাক্ষাৎ দায়ি পাগল ঠাকুর। পাগল ঠাকুর মত্ত হস্তি দিয়ে ফেলুর হাত ভেঙে দিয়েছিল। সেজন্য পাগল ঠাকুরের প্রতি ফেলুর স্বাভাবিক প্রতিশোধস্পৃহা সর্বদা জাগ্রত। তৎকালীন রাজনৈতিক বিচার-বুদ্ধিহীন মানুষেরা মোল্লা-মৌলবীদের ইশারায় ধর্মযুদ্ধে নেমে গিয়ে প্রাণ দিতেও প্রস্তুত। দেশভাগের প্রাক্-মুহূর্তে বাংলার ধর্মান্ধ বা ধর্মভীরু মানুষগুলি মৌলবাদীদের মতলব বুঝতে না পেরে আন্দোলিত হয়। তবুও বোঝা যায়, সেই মানুষগুলির মূল সংগ্রামের বিষয় অন্যত্র নিহিত। আকালুর মতো মৌলবাদী নেতার নেতৃত্বে ধর্মযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেও আকালুকেই ফেলুর সবচেয়ে বেশি ভয় হয়। ফেলুর ভয়, কখন আকালু তার বিবি আন্নুকে তুলে নিয়ে যায়। তাই ফেলু আকালুকে চোখে চোখে রাখে। বিবিকে হারানোর ভয় ফেলুকে সর্বদা তাড়িত করে। আকালু তার লোকবল তথা অর্থবল দিয়ে ফেলুকে সর্বদা ভয় দেখায় : "আকালুর দলভারি, সে পঙ্গু, তার অর্থবল নেই। সে গরিব। সে আকালুর কাছে কিছুই না। তবু সে তার পিছনে কেন লাগে! একটা বিবি তার।" [২৩] ফেলু আসলে দারিদ্র্যের শিকার। তার শারীরিক ও আর্থিক বলহীনতার সুযোগ অন্য ধর্মের মানুষ নয়, নিয়েছে তারই ধর্মের অন্য একজন মানুষ এবং তার আসল কারণ সেই মানুষটি অর্থবান এবং লীগের নেতা। কিন্তু ফেলুর কাছে দেশের চেয়ে বিবিই বড়, বিবির জন্য সে অসহায়, কেননা তার বিবিকে ছাড়া তার দিন চলে না। "বিবি তার হকের ধন। আন্নু তার দু'বিঘা জমি-জিরাতের মতো।" [২৪] সেই বিবিকে রক্ষা করার জন্য একচোখ আর এক হাত সম্বল করে ফেলুর কী প্রাণপণ চেষ্টা! এটাই ফেলুর জীবনের মূল সংগ্রাম। স্বাধীন ইসলাম-রাষ্ট্রের স্বপ্ন তার কাছে অস্পষ্ট মোহমাত্র। এই স্বাধীন ইসলাম-রাষ্ট্র পরিকল্পনায় সামসুদ্দিন, আকালুদ্দিন বা অন্যান্য মধ্যবিত্তদের যত প্রয়োজন, ফেলুর মত দীন দরিদ্রের ততটা নেই। আকালুর অনুচররা যখন এসে ফেলুকে বলে : "একটা ফসসালা কইরা ফ্যাল। আকালুসাব নেতা মানুষ, তার লগে তুমি পার?" [২৫] তখন সামাজিক নিপীড়নের ছবিটা স্পষ্ট হয়ে যায়। আকালুর অনুচররা ফেলুকে যখন তার বিবির জন্য তালাকনামা লিখতে পরামর্শ দেয়, তখন ফেলুর জীবন সংকটাপন্ন হয়ে ওঠে : "ফেলুর মনে হল বজ্রাঘাত মাথায়।

অথবা মনে হচ্ছে ওর মাথায় কারা হাতুড়ি পেটাচ্ছে। সে সেই দিনের মতো উঠে দাঁড়াল। ঘা-টা গামছায় ঢাকা। তবু মাছি ভনভন করছে। খড়ি উঠে গেছে শরীরে। তার শরীর সেই আদ্যিকালের একটা গাছের মতো। ডালপালা ভেঙে গেছে। তবু সে মহাসমারোহে দাঁড়িয়ে থাকার চেষ্টা করছে।''[২৬] এটাই সহায়সম্বলহীন ফেলুর সংকট ও সংগ্রামের প্রকৃত চিত্র। দেশভাগের জন্য মোল্লা-মৌলবী, হিন্দু জমিদার এবং ইংরেজ সরকার যখন দাঙ্গার ছক কষতে ব্যস্ত তখন শান্ত নিরিবিলি গ্রামের এইসব মানুষের জীবনসংগ্রাম চলমান থাকে সামাজিক অন্যায় এবং দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে। সেই সংগ্রামের শরিক ফেলু। ফেলুর সংগ্রাম দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে, সামাজিক অন্যায়ের বিরুদ্ধে এবং তার এই সংগ্রামের মূল কেন্দ্রে রয়েছে তার বিবি আন্নু। আন্নুর প্রতি তার ভালোবাসা কায়েম করার জন্যই ফেলু সব রকমের দুঃসাধ্য কাজ করতে পারে। আন্নু বিবির প্রতি ভালোবাসাই তাকে জীবনের এই ঘোরতর সংগ্রামের সৈনিকে পরিণত করেছে।

মুসলিম লীগের একটি মজলিসে ফেলু রান্নার কাজ করছিল। মত্ত হাতি সেই মজলিস লণ্ডভণ্ড করেছিল, যে হাতির পিঠে সওয়ার ছিলেন পাগল ঠাকুর। ফেলুর হাত সেই ঘটনার পর ভেঙে যায়। তারপর সেই হাত শুকিয়ে অসার হয়ে যায়। চরের দাঙ্গায় ফেলুর সেই হাত গুলিবিদ্ধ হয় এবং তাতে এক দুষ্ট ক্ষতের সৃষ্টি হয়। ঘা-য়ের গন্ধে আন্নু বিবি তার পাশে আসতে চায় না অথচ আন্নুই তখন তার একমাত্র সম্বল। এই পরিস্থিতিতেও ফেলু ভালো হয়ে ওঠার উপায় খোঁজে। এই ব্যাধি আরোগ্য হবার নয়, জেনেও তারিণী কবিরাজ ফেলুকে আরোগ্যলাভের উপায় বলে দেয়। ফেলুর বুকে আশা জেগে ওঠে। আরোগ্যলাভের আশায় ফেলু অন্ধকার রাতে একশোটা জোনাকি পোকা ধরার জন্য উন্মাদের মতো মাঠময় ছুটতে থাকে। তাকে একশোটা জোনাকি ধরতেই হবে। একসময়ের কিংবদন্তি হাডুডু খেলোয়াড় কালক্রমে আরোগ্যলাভের আশায় জোনাকির পিছনে ছুটছে। ফেলুর এই নৈশাভিযান আসলে মরীচিকার পিছনে ছোটা ছাড়া আর কিছুই নয়। কিন্তু সহায়সম্বলহীন ফেলু সেসব বোঝে না। আন্নুকে নিয়ে বাঁচার স্বপ্নে বিভোর ফেলু হয়ে ওঠে আরব্য রজনীর নায়কের মতই : ''ফেলুর মনে হল শরীরে তার পাখা গজিয়েছে। জোনাকির মতো দুই পাখা মেলে সেও যেন উড়ছে। কঠিন রুক্ষ্ম মাঠের উপর দিয়ে সে ভেসে যাচ্ছে। জোনাকিটা যেদিকে যাচ্ছে সেদিকে সে ভেসে যাচ্ছে। জোনাকিটা যত দুলে দুলে যাচ্ছে, সেও তত দুলে দুলে যাচ্ছে। সে কী হাজার আরব্য রজনীর গল্পের নায়ক হয়ে যাচ্ছে! তার যে কী ইচ্ছা এখন, আহা, সে কোথায় যাচ্ছে, তার যে কী ইচ্ছা, আল্লার কুদরতে সে আবার সব ফিরে পাবে, ...''[২৭] ফেলু আরোগ্যলাভের স্বপ্নে

বিভোর হয়ে বলতে থাকে — "আন্নুরে, আবার আমি ফেলু শেখ। তরে নিয়া উজানে যামু। আমার শরীরে পচা গন্ধ থাকবে না। তরে নিয়া যামু শহরে। আকালু তরে আর কি আতর আইনা দ্যায়, আমি দিমু তরে পারস্য দেশের আতর। আমার শরীর সবল হইলে কি দিতে না পারি তরে।" [২৮] কিন্তু ঘরে ফিরে ফেলু দেখে তার সব স্বপ্ন ব্যর্থ হয়ে গেছে। জোনাকি ধরে বাড়ি ফিরে সে দেখে তার ঘরে আন্নু বিবি নেই। ফেলু আর্তনাদ করে ওঠে : "... আন্নু, তুই আমারে ফ্যালাইয়া কই গেলি! আমার মাটি জমিন কার লাইগা!" [২৯] ফেলুর জীবনের এই মর্মান্তিক অবস্থার মধ্য দিয়ে লেখক বলতে চান মানুষের বড় আশ্রয় তার প্রিয়জনের ভালোবাসা। ফেলুর ক্ষেত্রে আন্নুই তার একমাত্র আশ্রয়। আন্নু না থাকলে ফেলুর কাছে পাকিস্তান, দেশ, জমিনের কোনো অর্থ থাকে না।

উপন্যাসে আমরা দেখি মহেন্দ্রনাথ সারাজীবন সংগ্রাম করে শেষে অন্ধ হয়ে গিয়েও তাঁর অন্ধত্বকে স্বীকার করতে চান নি, তিনি তাঁর পৌত্রদের সঙ্গে এমন খেলায় মেতে উঠেছিলেন যেন তিনি দেখতে পান। বয়সের ভার উপেক্ষা করেও তিনি বেঁচে থাকতে চান। চন্দ্রায়ণের প্রস্তাবে তিনি বিরক্ত হন, জোর করে বুকের কাশির শব্দ চেপে রাখেন এবং শেষে এই পৃথিবীতে আবার জন্মলাভের আশা প্রকাশ করেন তবু তিনি অপরাজেয় থাকতে চান। জীবন যুদ্ধে সহজে হার না মানার জন্য সামান্য ফেলুও মহেন্দ্রনাথের সমকক্ষ। ফেলুও হার না মানা মানুষের দলে। আকালু ফেলুর বিবিকে পালিয়ে নিয়ে যাওয়ায় ফেলু উন্মত্ত হয়ে ওঠে। ফেলুর কাছে মুসলিম রাষ্ট্রের অলৌকিক ধারণা অর্থহীন হয়ে ওঠে।

ফেলুর হাত ভেঙে যাওয়ার জন্য দায়ি প্রথমত পাগল ঠাকুর মণীন্দ্রনাথ। সুতরাং সে তার প্রথম প্রতিপক্ষ। দ্বিতীয় প্রতিপক্ষ হাজিসাহেবের ধর্মের ষাঁড়, তৃতীয়ত আকালু। এদের বিরুদ্ধে ফেলুর সংগ্রাম। উন্মত্ত ফেলু তাঁর বিবিকে খুঁজতে বেরিয়ে ঝড়জলের রাতে পীরের দরগার পাশে পাগল ঠাকুরকে পেয়ে প্রথমে তাকে হত্যা করে। এরপর ফেলুর সামনে প্রতিপক্ষ হিসেবে থাকে আকালু আর হাজিসাহেবের ধর্মের ষাঁড়। বাগে পেয়ে ফেলু সেই ধর্মের ষাঁড়ের গলায় চাকু চালিয়ে দেয়। মৃত্যু যন্ত্রণায় উন্মত্ত ষাঁড়টিও শিং দিয়ে ফেলুর পেট এফোঁড়-ওফোঁড় করে কাফিলা গাছের সঙ্গে গেঁথে দেয়। এভাবে শরীরের শেষ রক্তবিন্দু থাকা পর্যন্ত ফেলু তার সংগ্রাম অব্যাহত রাখে। আন্নু বিবির জন্য আরোগ্যলাভের আশায় ফেলু প্রাগৈতিহাসিক জীবের মত বনে জঙ্গলে ঘুরে বেরিয়েছিল এবং শেষ পর্যন্ত লড়াই করে মৃত্যুবরণ করেছিল। গ্রামের সাধারণ মানুষের দৃষ্টিতে ফেলু হার্মাদ মানুষ। তাই, মৃত্যুর পর কেউ তাকে কবরে দেবার

আয়োজনটুকুও করতে সচেষ্ট হয়নি। লেখক ফেলুর এই জীবনসংগ্রামকে মানুষের অস্তিত্ব রক্ষার মহাসংগ্রামের পর্যায়ে তুলে ধরতে চেয়েছেন। লেখক স্বয়ং ফেলুর এই মৃত্যুতে বিবৃতি দিয়েছেন : "আহা ফেলু তুমি একখানা মানুষ। তোমার জয় দিবার কেউ নাই হে। আমি লেখক তোমার হয়ে জয় দিলাম। ফেলু তুমি বড় মানুষ হে। তুমি জান লড়াই করতে। তোমাকে এভাবে মরতে দেখে আমার ভারি কষ্ট হচ্ছে।"[৩০] লেখক মানুষের এই জীবনসংগ্রামকে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন। যে জীবনের শেষ রক্তবিন্দু থাকা পর্যন্ত লড়াই করতে জানে, সেই মানুষ অবশ্যই একজন শ্রদ্ধাভাজন সৈনিক। পাগল ঠাকুরের মৃত্যুতেও লেখক এতটা বিহ্বল হননি, কারণ তিনি তো জীবনযুদ্ধে হার মেনে নেওয়ার ফলে পরাজিত মানুষ। পাগল ঠাকুর পিতার ধর্মীয় সংস্কারজাত আদেশকে বিনাবাক্যব্যয়ে মেনে নিয়ে শেষে অপ্রাপ্তি আর অনুশোচনার পাপে উন্মাদগ্রস্ত হয়েছেন। পাগল ঠাকুর তাঁর ভালোবাসার পাত্রী পলিনকে পাওয়ার জন্য পিতার ধর্মীয় সংস্কারের বিরুদ্ধে কোনো সংগ্রাম করেননি। কিন্তু ফেলু তার আন্নু বিবিকে ফিরে পাওয়ার জন্য প্রাগৈতিহাসিক জীবের মত অন্ধকার রাতে জোনাকির পিছনে ছুটে বেরিয়েছে এবং আন্নু বিবিকে পাওয়ার অন্তরায় স্বরূপ বাধাগুলির বিরুদ্ধে জীবনের শেষ রক্তবিন্দু থাকা পর্যন্ত লড়াই করেছে। ফেলু কর্তৃক পাগল ঠাকুরের গলায় ছুরি বসানোর যে দৃশ্য লেখক বর্ণনা করেছেন, তাতে পাগল ঠাকুরের মৃত্যুতে ফেলুর আত্মতৃপ্তির ভাবটা যতটা প্রকট, পাগল ঠাকুরের মৃত্যু যন্ত্রণা যেন ততটা প্রবল হয়ে ওঠে না। প্রতিশোধ নিয়ে হার্মাদ ফেলু মহান হয়ে ওঠে। পাগল ঠাকুরের মৃত্যু ফেলুর কাছে যেন কোনো মনুষ্যেতর জীবের মৃত্যুর সমতুল্য ঘটনা। তার কাছে পাগল ঠাকুর মানুষটা হাজিসাহেবের খোদাই ষাঁড়ের মত, কখনও মনে হয় — জবাই করা মুরগি। লেখক বর্ণনা দিচ্ছেন : "ঘারটা শক্ত। মুখ হাঁ করা। কত অনায়াসে সে পিছন থেকে গলাতে নিমেষে পোঁচ মেরে দিয়েছিল। ঠিক হালার জবাই করা য্যান একটা মুরগি। টেরও পেল না মানুষটা পিছনে তার দুশমন। চোখের পলকে গলা হ্যাৎ করে দিল ... অন্ধকার এত তীব্র, এত ঘন যে সে দেখতে পেল না ঠাকুরের মুখটা ব্যথায় নীল হয়ে যাচ্ছে। সে কেবল দেখল যেন একটা জবাই করা মুরগি উড়ে উড়ে বনের ভিতর লাফাচ্ছে।"[৩১] — এই বর্ণনার মধ্য দিয়ে লেখক ফেলুর মতো জীবনযুদ্ধে হেরে যাওয়া মানুষের অপরাজেয় মানসিকতা আর সংগ্রামশীলতার প্রতিই শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেছেন।

তুচ্ছাতিতুচ্ছ কত চরিত্র এই উপন্যাসে স্থান পেয়েছে, কিন্তু জীবন প্রবাহের ধারায় তাদের কারও মূল্যই কম নয়। তারা প্রত্যেকেই নিরন্তর জীবন প্রবাহের শরিক হয়ে ওঠে। ব্রিটিশ

সাম্রাজ্যবাদ থেকে স্বাধীনতায় উত্তোরণের মুহূর্তে দেশভাগ ঘটেছে। দেশভাগের সমকালের মানুষের নিস্তরঙ্গ জীবনে সেই বিভাজনের আঘাত অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠেছে। আবেদালির ছেলে জব্বার লীগে নাম লেখায়। ধর্মীয় রাজনীতিতে অংশগ্রহণের ফলে জব্বর তার প্রতিবেশীর প্রতি সহানুভূতির কথা বিস্মৃত হয়। পাগল ঠাকুর মণীন্দ্রনাথ বৃষ্টিতে ভিজে যাচ্ছেন, এই খবর ঠাকুর বাড়িতে পৌঁছে দিতে জব্বর অস্বীকার করায় আবেদালি আক্ষেপ প্রকাশ করে : ''আল্লা, দ্যাশে এটা কী শুরু হইল।'' [৩২] ততদিনে ঢাকায় ছয় দফা সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সংঘটিত হয়েছে। ইতিহাস এভাবেই বাঁক নেয়। নতুন কালের সূচনা হয়। কিন্তু জীবন এগিয়ে চলে মানুষের সঙ্গে মানুষের আত্মীয়তাবোধ আর ভালোবাসাকে সঙ্গী করে। রায়টে মুসলমান 'জবাই' হওয়ার খবরে আবেদালি উত্তেজনাবোধ করে — এ তার ধর্মবোধের প্রতিক্রিয়া, কিন্তু তার স্বধর্মের মানুষ নিধনের দুঃখ মুছে যায় — যখন মনে পড়ে পুরুষানুক্রমে তারা হিন্দুদের সঙ্গে আত্মীয় সম্পর্কে আবদ্ধ। আবেদালির সব দুঃখ ও উত্তেজনার প্রশমন ঘটে, সে মাথলা মাথায় ঝড়-জলের রাতে পাগল ঠাকুরকে খুঁজতে বেরিয়ে পড়ে। 'ধর্ম বড় নয়, মানুষ বড়' — লেখকের এই উপলব্ধি তাঁর সৃষ্ট চরিত্রের কণ্ঠেও ধ্বনিত হয়। আবেদালির আত্মদর্শনেও এক ঝাঁক নীলকণ্ঠ পাখি উড়ে যায় : ''দরজার ভিতর থেকেই হাত বাড়াল আবেদালি। একটা মাথলা মাথায় টেনে অন্ধকার পথে নেমে গেল।'' [৩৩] এভাবে ধর্মীয় সংস্কার ভেঙে মানুষ মানুষের প্রতি হাত বাড়ায়। তার সমস্ত দ্বিধা-সংকোচ মুছে যায়।

ইতিহাসের সন্ধিক্ষণে সামসুদ্দিন ওরফে সামু প্রকৃত জাতীয়তাবাদী অভিমত ত্যাগ করে ধর্মীয় রাজনীতিতে নেমে পড়ে। সে ঢাকা শহর থেকে এসে নিস্তরঙ্গ গ্রামে মুসলিম লীগের অফিস খুলে বসে। শহুরে সামুর সুচতুর রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপের প্রথম পদক্ষেপ ছিল গ্রামের বুভুক্ষু মানুষের জন্য জলসার আয়োজন করা। কোনো রাজনৈতিক মতাদর্শ নয়, বুভুক্ষু মানুষের ধর্মীয় আবেগই তার সম্বল। সামুর এই আচরণের প্রতি শচীন্দ্রনাথের সংশয় দানা বাঁধে। তাই সে সামুর উদ্দেশ্যে বলে : ''হঠাৎ পান্ডা সাজলা। আগে না আজাদের খুব ভক্ত আছিলা।'' [৩৪] এভাবে সামসুদ্দিন ধর্মের নামে দেশভাগের জন্য রাজনৈতিক মঞ্চ পরিবর্তন করে, বঞ্চিত-শোষিত মানুষকে বিপথে চালিত করতে উদ্যোগী হয়। অন্যদিকে পাগল ঠাকুরের মত মানুষের প্রতি যে তারও একটা নৈতিক দায়িত্ব থাকতে পারে সেটা সে ভুলতে বসেছে। এভাবে দেশভাগের সমকালে মানুষ মানুষের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হতে থাকে।

একদিকে যখন সামুর মত মৌলবাদী নেতারা ধর্মীয় আবেগকে কাজে লাগিয়ে দেশভাগের

ষড়যন্ত্রে লিপ্ত তখনও বাংলার এক শ্রেণির মানুষ শোষণ-যন্ত্রণায় ক্লিষ্ট। এইসব বঞ্চিত মানুষের শ্রেণি-পরিচয়ের কথা লেখক তাঁর স্বভাব সিদ্ধ ভঙ্গিমায় দিয়েছেন মুসলমান গ্রামের বর্ণনা প্রসঙ্গে। শচীন্দ্রনাথ লীগের নেতা সামুর সঙ্গে যে মুসলমান গ্রামগুলির মধ্য দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলেন, সেই সব গ্রামের বর্ণনায় লেখক মানুষের বঞ্চনার চিত্র এঁকেছেন : "ঘরগুলি পরস্পর এত বেশী সংলগ্ন যে, শচীকে প্রায় সময়ই নুইয়ে পথ পার হতে হচ্ছিল, একটু সোজা হয়ে দাঁড়ালেই ঘরের সনচা এসে মাথায় ঠেকছে। এই বাড়িঘরের যেন কোনো নির্দিষ্ট সীমানা নেই — একটা বাড়ির সঙ্গে আর একটা বাড়ি লেগে আছে — কার কোন ঘর, কে কোন বাড়ির মালিক মাঝে মাঝে শচীর পক্ষে নির্দিষ্ট করা কঠিন হয়ে পড়ে। শেষ বাড়িটা আবেদালির।" [৩৫] এখানে আবেদালি এইসব গরিব মানুষের প্রতিনিধি। এই মানুষগুলির আলাদা কোনো ব্যক্তি-পরিচয় নেই। এরা সবাই ছোট ছোট কুঁড়েঘরের বাসিন্দা, সবাই গরিব বঞ্চিত এবং শোষিত মানুষ — এটাই তাদের শ্রেণিগত পরিচয়। শচী আর সামুর মধ্যে পার্থক্য অতি স্পষ্ট কিন্তু আবেদালিরা পরস্পর সংলগ্ন। দেশভাগের সমকালে এইসব মানুষের জীবনসংগ্রামের কথাও লেখক 'নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে' উপন্যাসে স্থান দিয়েছেন।

পুরুষের বহুচারিতার শিকার আবেদালির দিদি জোটন। তার তিন বার নিকাহ্ হয়েছে। সে এখন চতুর্থবারের অপেক্ষায়। জীবনকে উপভোগ্য করে তোলার ইচ্ছাই তাঁর বেঁচে থাকার সংগ্রামকে চালিত করে। শরীরের অদম্য ইচ্ছাগুলিসহ সে বাঁচতে চায়। লেখক একদিকে যেমন জোটনের দারিদ্র্য-কন্টকিত জীবনসংগ্রামের কথা বলেন, অন্যদিকে তেমনি জোটনের সেই জীবনসংগ্রামের মৌল প্রেরণার দিকটিও উজ্জ্বল করে তোলেন। লেখক জানাচ্ছেন : "তালাক অথবা স্বামীর মৃত্যুর পর জোটন প্রতিবার আবেদালির কাছে চলে আসে। আবেদালি তখন লতা আর খড়ের সাহায্যে উত্তরদুয়ারি ছোট্ট খুপ্‌রি ঘরটা তুলে দেয় — এই পর্যন্ত আবেদালির সঙ্গে জোটনের সম্পর্ক। তারপর কিছুদিন ধরে জোটনের জীবনসংগ্রাম। ধান ভেনে দেওয়া, চিঁড়া কুটে দেওয়া পাড়া প্রতিবেশীদের এবং যখন বর্ষাকাল শেষ হয়, যখন হিন্দু গৃহস্থের পূজা-পার্বণ শেষ তখন জোটন অনেক দুঃখী ইমানদারের সঙ্গে ভাতের হাঁড়িটা ধুয়ে পাক্‌লে জলে নেমে পড়ে। এবং সব পাট খেত চষে বেড়াতে থাকে শালুকের জন্য। শালুক শেষ হলে আবেদালির কাছে নালিশ — দ্যাশে কি পুরুষমানুষ নাইরে আবেদালি।" [৩৬] পূর্ব বাংলার গরিব মুসলমান গ্রামগুলির অসংখ্য মানুষের জীবন-ইতিহাসের নির্যাস এই উপন্যাসে এভাবেই পাওয়া যায়।

দারিদ্র্য আর অনাহারের নিত্য অন্ধকারের মধ্যেও জোটন সুখ পাখি খোঁজে। পেটে ভাত

নাই, শালুক সেদ্ধ খেয়ে দিন কাটে তার। ধান খেতে সে ঘুরে বেরায় কচ্ছপের ডিমের অন্বেষণে। মাঝে মাঝে জোটন অন্যের ধান খেত থেকে ধানের ছড়া কেটে কোঁচড়ে ঢোকায়, তবু সে তার মনের মানুষ ফকিরসাবের অপেক্ষায় থাকে। তেরোটি সন্তানের জননী জোটন চল্লিশোর্ধ বয়সেও আবার 'শরীরের মাশুল' তুলতে চায়। জোটন আবার মা হতে চায়। প্রকৃতি যেমন বার বার সুফলা হয়ে তার অন্তঃপ্রকৃতির পরিচয় দেয়, জোটনও তেমনি করে বার বার সন্তানবতী হয়ে প্রকৃতির প্রতীকরূপে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। রাতের অন্ধকারে শরীরের বেওয়ারিশ ইচ্ছাগুলিকে সে তাড়াতে থাকে কিন্তু পারে না। জোটন ফকিরসাবের স্বপ্ন দেখে : "জোটন বিবির স্বপ্ন জাগছে চোখে, বেতঝোপে বেথুনের মতো এই স্বপ্ন কবে টস টস করে পাকবে ... জোটন স্বপ্নের কথা ঠিকঠাক ভাবতে পারছে না ... স্বপ্নটা গাজীর গীদে গায়ানদারের হাতে ছড়ি য্যান; চাঁদের মতো মুখ করে চ্যাপ্টা নাকে চোখে জোটনের সকল সুখকে দ্যাখতাছে।" ৩৭ রাতে পীরের দরগায় সুখের হীরামন পাখির কথা মনে করে জোটনের শরীর বিহ্বল হতে থাকে। জোটনের ইচ্ছার ঘরে এই সুখ পাখি যেন মুক্ত বিহঙ্গ। বহুদিন পর ঠাকুর বাড়িতে পেটপুরে খেতে পেয়ে তার শরীর জেগে ওঠে : "এই গরমে জলের ঠাণ্ডাটুকু, আকাশের স্বাচ্ছন্দ্যটুকু এবং পুবদিকের বড় চান্দের হাসি জোটনের ভিতর কতদিন পর মাশুল তুলতে বলছে। আকণ্ঠ খেয়ে শরীরে এখন কতরকমের শখ জাগছে।" ৩৮ এমন সময়ে জলে নৌকো বেয়ে মনজুর তার কাছে আসে। মনজুর তার বিবিকে যথার্থই ভালোবাসে কিন্তু জোটনের বে-আব্রু আহ্বানে সে সারা দিতে বাধ্য হয় : "ইচ্ছার সংসারে মনজুর পুতুল সেজে বিবির মরা মুখ দেখতে দেখতে বলল, ক্যাডা কান্দে ল।" ৩৯ লেখক নির্বিকার ভঙ্গিতে এভাবে মানুষের ইচ্ছার সংসারের কথা বলেন। জীবনের এই অকৃত্রিম আদিমতাকে উপেক্ষা করা যায় না। জীবনের যেকোনো অবস্থাতেই মানব-মনের ইচ্ছাপাখি মুক্তির ডানা মেলে উড়তে চায়। এই উপন্যাসে জোটন ও মনজুরের মিলন দৃশ্য সেই জীবনসত্যের পরিচায়ক।

লেখক জোটন বিবিকে শেষ পর্যন্ত শরীরসর্বস্ব করে রাখেননি। দরগার ফকিরসাবের সংস্পর্শে এসে জোটন বিবিও পীরানি হয়ে যায়। দরগায় এসে জোটন চোখের সামনে কত মানুষের 'ইন্তেকাল' দেখেছে তার ইয়ত্তা নেই। জীবন-মৃত্যুর নিরন্তর খেলা দেখতে দেখতে জোটন বিবিও নির্মম জীবনসত্যকে জেনেছে। মানুষের কামনাসর্বস্ব শরীরও তাই তার কাছে গঙ্গার জলের মতো পবিত্র। ধর্ষিতা মালতীর প্রতি তাই তার দার্শনিক সুলভ উক্তি : "কি আছে, আর যা হইবার হইছে। এডা তো আর হাঁড়ি পাতিল না। এডা তো সোনার অঙ্গ। ছুঁয়া দিলে জাত

যায় না। কার জাত! তোমার না মানুষের?'' [৪০] এভাবে জোটন বিবি জাতপাতের উর্ধ্বে উঠে যায়। গ্রামের সম্পন্ন হিন্দু-মুসলমান মানুষেরা যখন জাত-ধর্মের নামে পরস্পরের বিরুদ্ধে ক্রমশ দুই শিবিরে বিভাজিত হয়ে চলেছে তখন ঈশম, জোটন ফকিরসাবের মত নীচু তলার মানুষগুলি সেই জাত-পাতের উর্ধ্বে মানুষে মনুষ্যত্বকেই মহিমাময় করে তুলেছে। ঈশম-জোটন-ফকিরসাবেরের মত মানুষগুলির কাছে জাতকুল বড় কিছু নয়, মনুষ্যত্বই বড় কথা, এমনকি শারীরিক শুচিতা-অশুচিতার প্রশ্নেও তারা মানুষের অস্তিত্বকে আগে স্থান দিয়েছেন। তাই, ঈশমের কাছে যেমন হার্মাদ মানুষ ফেলু অপবিত্র নয়, তেমনি জোটন ও ফকিরসাবের কাছে ধর্ষিতা মালতীর শরীর গঙ্গার জলের মত পবিত্র : ''ফকিরসাব বললেন, কার অঙ্গ! অঙ্গ আপনের, সোনার অঙ্গে কালি লাগলে ধুইয়া ফেলান। সোনার অঙ্গে কালি কতক্ষণ লাইগা থাকে! ঠাইরেন, গাঙ্গের পানিতে কতকিছু ভাইসা যায়, কিন্তু ঠাইরেন, মা জননীর কি কিছু হয়? যেন ফকিরসাবের বলার ইচ্ছা, মাগো জননী, আপনেরা নিজের জলে নিজে ধুয়ে যান।'' [৪১] ধর্ষিতা মালতীর নগ্ন পা দুখানিকে জোটনের মনে হয়েছিল 'যেন দুর্গা ঠাকুরের পা'।

মালতীকে উদ্ধার, শুশ্রূষা এবং নরেন দাসের বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে জোটন ও ফকিরসাব যে মানবিক দায়িত্ব পালন করেছে তার মধ্য দিয়েই তারা রক্তমাংসের মানুষ থেকে পীর-পীরানিতে পরিণত হয়েছে। সাধারণ মানুষও মানবিক মহত্বের গুণে মহৎ চরিত্রের সমকক্ষ হয়ে ওঠে। কলেরায় আক্রান্ত ফকিরসাব নিজের জীবন বিপন্ন জেনেও মালতীকে তার আশ্রয়ে পৌঁছে দিতে চায় : ''এবং মনে হয় তিনি যেন এক প্রাচীন পুরুষ, তপোবনে মহর্ষি কণ্বদেব, শকুন্তলাকে নিয়ে রাজার কাছে যাচ্ছেন। যে কোনও ভাবে গ্রামে তাকে পৌঁছে দিতে হবে। ভিতরে ভিতরে হাঁসফাঁস করছেন, কিন্তু কাউকে কিছুতেই বুঝতে দিচ্ছেন না। বেহুঁশের মতো লগি মারছেন কেবল।'' [৪২] এভাবে ফকিরসাব মানবিক দায়িত্ব পালন করে লৌকিক মানব থেকে অলৌকিক মহিমায় উত্তীর্ণ হয়। মালতীকে আশ্রয়ে পৌঁছে দেবার জন্য ফকিরসাব মিথ্যার আশ্রয় নিতেও সংকোচবোধ করেন নি। তিনি মালতীকে নরেন দাসের আশ্রয়ে পৌঁছে দিয়ে বলেছিলেন যে, মালতীর সতীত্ব নষ্ট হয়নি। তারপর নৌকায় ফিরে ফকিরসাব শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। যে মানুষ একদা হত্যার দায়ে বিবাগী হয়েছিলেন, সমস্ত ঐশ্বর্য ছেড়ে আশ্রয় নিয়েছিলেন পীরের দরগায়, তিনিই আবার এভাবে একটি অপহৃতা বিধবাকে তার আশ্রয়ে পৌঁছে দিয়ে ঈশ্বরের সমান মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হলেন। একদা খুনি মানুষও সৎকর্মের দ্বারা এভাবে পীর-দরবেশ হতে পারে। মানুষের এই মহিমার কথা, মানুষের এই অনন্ত ইচ্ছার কথা, যা মানুষকে কখনও কখনও

ঈশ্বরের সামিল করে তোলে — তা উপন্যাসটির অমূল্য সম্পদ।

মানুষ তার যাবতীয় ইচ্ছাশক্তির প্রয়োগের দ্বারা কাঙিক্ষত লক্ষ্যে পৌঁছাতে চায় আর এরই জন্য তার নিরন্তর সংগ্রাম। ফকিরসাব চরিত্রের ক্রমপরিণতিতে সে কথাই পরিস্ফুট হয়। একদা খুনি মানুষ দীর্ঘ ছদ্মবেশী জীবনযাপনের পর যখন মুশকিল আসানের লম্ফ হাতে অন্ধকারে ঘুরে বেরান, তখন তাঁর সেই আচরণের ভণ্ডামির অন্তরালে মানবিক উত্তরণের পথ তৈরি হয়। ফকিরসাব ক্রমে পীর হয়ে ওঠেন। তাঁর মৃত্যুতে জোটন বিবি আর্তনাদ করে বলেন : "এই বেলা জোটনের কসম, আপনে পীর বইনা গেলেন ফকিরসাব!" [৪৩] একদা ফকিরসাব মানুষের ইন্তেকালের সময় দরগার গাছে গাছে মোমবাতি জ্বালাতেন, নিত্য-নতুন অলৌকিক কায়দা-কৌশল উদ্ভাবন করতেন। তিনি কত সাহসী এবং আল্লার বান্দা — এটিই প্রমাণ করতে চাইতেন। তাঁকে দেখে সবার ভয় পাবার কথা, মানুষ মৃতদেহ কবর দিতে এসে তাঁকে দেখে ভয় না পেলে যেন তাঁর মান-সম্মান থাকে না। আসলে ভীতু মানুষ এই ফকিরসাব। খুনের দায়ে তিনি বরিশালের ভোলা অঞ্চল থেকে পালিয়ে গা-ঢাকা দিয়েছিলেন আস্তানাসাবের দরগায়। অভাব-অনটনের মধ্য দিয়ে তিনি দিনযাপন করতেন। তাঁর ভরসা ছিল মুশকিল আসানের লম্ফ। এইভাবেই তিনি একদিন জোটনকে তাঁর সঙ্গী করে নিলেন। জোটন একসময় শামুক দিয়ে মানুষের ধানের শিষ কেটে বেরাত। সেও এই ফকিরসাবের সংস্পর্শে ক্রমশ ধর্মপ্রাণ হয়ে ওঠে। জোটন একদা তার শরীরের ইচ্ছা নিবৃত্তির জন্য ফকিরসাবের সঙ্গী হয়েছিল আর ফকিরসাব খুনের শাস্তির হাত থেকে বাঁচতে, শতচ্ছিন্ন আলখাল্লা পরে পেটের দায়ে, মুশকিল আসানের লম্ফ হাতে ঘুরে বেরাতেন। গতানুগতিক জীবন থেকে নতুন জীবনের অন্বেষণেই জোটন ও ফকিরসাবের সে ছিল এক অলৌকিক যাত্রা, প্রকারান্তরে জীবনের অনন্ত রহস্যের অন্বেষণ। ব্যক্তি মানুষের জীবনসংগ্রাম ও জীবনান্বেষণের বহুবৈচিত্র্যকে, বিপুলা এবং নিরন্তর মানব প্রবাহের নানা মাত্রাকে এভাবেই ঔপন্যাসিক উপস্থাপন করেন।

উপন্যাসে ভারতছাড়ো আন্দোলনের প্রেক্ষাপট উল্লিখিত হয়েছে। মহেন্দ্রনাথের বড় ছেলে ভূপেন্দ্রনাথ মুড়াপাড়ার বাবুদের কাছারি বাড়িতে কর্মসূত্রে অর্ধসাপ্তাহিক আনন্দবাজার পত্রিকা পড়ার সুযোগ পান। তিনি গ্রামে ফিরেই দেশের খবর বলতে থাকেন। তিনি তখন গ্রামের মানুষের মধ্যমণি হয়ে ওঠেন। তিনি দেশের খবর, বিদেশের খবর, বলতে শুরু করেন। সম্পর্কে ভাইপো হারানকে তিনি বলেন : "এদিকে তোমার সারা ভারতে আইন অমান্য আন্দোলন চালাইতেছেন গান্ধী। ইংরেজরাও ছাইড়া কথা কইতাছে না। লাঠি চালাইতেছে। গুলি করতাছে।

এদিকে তোমার বিলাতের প্রধানমন্ত্রী লীগের পক্ষ নিছে। সুতরাং বুঝতেই পারছ লীগের পোয়াবার।''[৪৪] আমরা জানি, ভারতছাড়ো আন্দোলনে গান্ধিজির কারাবরণের সুযোগে মুসলিম লীগ ক্ষমতা বৃদ্ধির সুযোগ পেয়েছিল। উপরন্তু, এই সময়ে বিদেশী শাসকবর্গ লীগ-তোষণ নীতি অবলম্বন করে। এর ফলেই বাংলায় হিন্দু-মুসলমানের বিভাজন এবং দাঙ্গার পটভূমি রচিত হয়। বাংলার রাজনৈতিক অস্থিরতার এই পটভূমিতে লেখক গরিব দুঃখী মানুষের প্রকৃত সংগ্রামের কথা বলেছেন।

সামসুদ্দিন যখন গাছে গাছে লীগের ইস্তাহার ঝুলিয়ে দেয় তখন মুসলমান গ্রামের বউরা গোপাটে (নীচু জমিতে) শালুক খুঁজে বেরায়। ব্যবসায়ী নৌকার মাঝি আবেদালির বউ জালালির সংগ্রাম তার দারিদ্র্যের সঙ্গে। সামসুদ্দিন গ্রামের বুভুক্ষু মানুষের দারিদ্র্যকে দেশভাগের অস্ত্রে পরিণত করতে চায়, কিন্তু দারিদ্র্য নিবারণ তার ব্রত নয়। তাই সামসুদ্দিনের ডাকা মজলিসের গোস্ত রান্নার গন্ধ, ঝুলন্ত জামরুল ফল আর মালতীর হাঁসগুলিকে দেখে জালালির ক্ষুধা বৃদ্ধি পায়। সামসুদ্দিন তাঁর মজলিসে মুসলমান মানুষগুলিকে একত্রিত করলেও সেই মজলিসের খাদ্য জালালির ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্য নয়। খিদের জ্বালায় তাই মালতীর হাঁসগুলিকে লক্ষ্য করে জালালি গোপাটের জলে নেমে যায়। জালালির খিদে তাকে প্রাগৈতিহাসিক জীবে পরিণত করেছে। আত্মরক্ষা এবং আত্মবিস্তার — এই দুই মৌল জীব-ধর্মের প্রকট রূপ প্রত্যক্ষ করা যায় জালালির মধ্যে। আত্মরক্ষার জন্য জালালি যেন একটি প্রাগৈতিহাসিক জীবমাত্র। তাই মালতীর একটি হাঁসকে সে ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্যই ধ'রে রেখেছে জলের নীচে। পাশ দিয়ে তখন সামসুদ্দিনের নৌকো চলে যাচ্ছিল। লেখক বর্ণনা দিচ্ছেন : ''একদল হাঁস ভয়ে প্যাঁক প্যাঁক করতে করতে পুবের বাড়ির দিকে ছুটছে। আর তখন সে দেখল পানির তলা থেকে কাদামাটি সব উপরে উঠে আসছে। যেন কোনও গো-সাপ একটা বড় সাপকে ধরে পানির নিচে সামলাতে পারছে না, যেন পানির নিচে ঝোপের পাশে একটা প্রাগৈতিহাসিক জীব হেঁটে বেড়াচ্ছে।''[৪৫] জালালি সেই মৃত হাঁসটি নিয়ে জলে সাঁতার কাটে 'গিরগিটির মত', তার মুখটা তখন 'যথার্থই শেয়ালের মত'। এভাবে জালালির ক্ষুধা নিবৃত্তির সংগ্রামকে লেখক জান্তব রূপ দান করেন। মালতীর হাঁসটিকে মেরে ফেলার পর জালালি খিদেয় কাতর নয়, খিদেয় মরিয়া হয়ে উঠেছিল। কাতরতা তো মানুষের, জালালি যেন আর মানুষ নেই, তার তুলনা তখন গোসাপ, গিরগিটি কিংবা শেয়ালের সঙ্গে অর্থাৎ মনুষ্যেতর প্রাণীর সঙ্গে। জৈবিক ক্ষুধা তখন জালালির জীবনের সবচেয়ে বড় সত্য। লেখক বর্ণনা দিয়েছেন : ''পুরুষ্ট হাঁসের পেটটা এখনও

নরম এবং উষ্ণ। ... যখন অন্ধকার ধীরে ধীরে গাঢ় হচ্ছে তখন উষ্ণ পেটটাতে আর একবার হাত রাখল। সে গামছা তুলে ফের মৃত হাঁসটাকে উঁকি দিয়ে দেখল। এবং চাপ চাপ অন্ধকারের ভিতর মৃত হাঁসটার পেটে হাত রেখে ফের বড় রকমের একটা ঢোক গিলে মাংস খাবার লোভে মরিয়া হয়ে উঠল।" [৪৬] ক্ষুধা নিবৃত্তির উপায় হয়ে গেলে জালালির মনে পড়ে তার স্বামী আবেদালির কথা, — "কি ভেবে জালালি তলপেটে হাত রাখল এবং ভাবল এই তলপেটে ফের চর্বি হবে, ফের আবেদালি গয়না নৌকার কাজ সেরে ঘরে ফিরবে।" [৪৭] ক্ষুধা নিবৃত্তির উপায় খুঁজে পেয়েই প্রথমে জালালির মনে পড়ে তার স্বামীর কথা, তারপর তার সহানুভূতি জেগে ওঠে বিধবা মালতীর প্রতি এবং ক্ষুধা নিবৃত্তির পর সে নিবিষ্টমনে নামাজ পড়তে থাকে। সামসুদ্দিন সবকিছু জেনেও জালালিকে কিছুই বলতে পারে না। এইসব হা-অন্ন মানুষের নিত্য-দুর্দশার সামনে সামসুদ্দিনের দেশভাগের স্বপ্নকে কালনেমির লঙ্কাভাগের তুল্য অলীক বলে মনে হয় : "সামু গরিব এই মানুষগুলির জন্য ফের অরণ্যের ভিতর হেঁটে যেতে চাইছে, সুতরাং মালতীর হাঁস চুরির কথা অথবা জালালির পেট পাড়া দিয়ে গোস্ত বের করার কথা সব কেমন যেন মন থেকে থেকে নিঃশেষে মুছে গেল। ... দীর্ঘ এই সংসার যাত্রার আসরে সে যেন কালনেমির মতো এক অলীক লঙ্কাভাগে মত্ত।" [৪৮] লেখক মানুষের ভেতরকার মনুষ্যত্বকে এভাবেই আবিষ্কার করেন। লেখকের দৃষ্টিতে মানুষ আসলে দোষ-গুণে মানুষ; সে ঈশ্বরও নয়, আবার শয়তানও নয়। মানুষের মধ্যে জৈব-প্রবৃত্তি, হিংসা-প্রতিহিংসা যেমন রয়েছে, তেমনি সেই মানুষের মধ্যেই সহানুভূতি ও ক্ষমার মত মহৎ গুণও রয়েছে। এভাবেই লেখক এই উপন্যাসে মানুষের বহুমাত্রিক পরিচয় আবিষ্কার করেছেন।

উপন্যাসে জালালির জীবনসংগ্রাম মূলত দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে কিন্তু সে বেঁচে থাকতে চায় আবেদালির জন্য। ব্যবসায়ী নৌকার মাঝি আবেদালি ঘরে ফিরবে, সেই আশাতেই জালালি বেঁচে থাকার জন্য মালতীর হাঁস চুরি করে খায়। আবেদালির জন্য জালালি তার শরীরের প্রতি যত্ন নিতে চায়। বেঁচে থাকার জন্যই আবেদালির অবর্তমানে জালালি ফাওসার বিলে শালুক সংগ্রহ করতে গিয়ে গজার মাছের আক্রমণে নিহত হয়। এভাবে প্রতিবছর ফাওসার বিলে গরিব দুঃখী মানুষ ডুবে মরে, ফাওসার বিলে মানুষ ডুবে মরার চলমান কিংবদন্তি রক্ষা পায়। দেশ যখন ধর্মের নামে হিন্দু মুসলমান — এই দুই শিবিরে বিভক্ত তখনও রসো, বুড়ি আর জালালিরা ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্য শালুক তুলতে গিয়ে ফাওসার বিলে প্রাণ হারায়। জাত-ধর্ম নির্বিশেষে এইসব অন্নহীন মানুষ ফাওসার বিলে শহিদ হয়। দেশভাগ-সমকালে এইসব নিরন্ন

মানুষের জীবনসংগ্রামের কাহিনিকে লেখক যথাযোগ্য মর্যাদায় তাঁর উপন্যাসে স্থান দিয়েছেন।

নরেন দাসের ছোট বোন মালতী। ছায়াঘেরা গ্রামের পরিবেশে সেও খুঁজে বেরাত নীলকণ্ঠ পাখি : "ছোট বোনটা এ-বাড়ির যেন প্রজাপতির মতো ছিল। শুধু সারাদিন উড়ত, উড়ত। গাছের ছায়ায় পুকুরের পাড়ে-পাড়ে লটকন গাছের ডালে-ডালে মেয়েটা যেন নীলকণ্ঠ পাখি খুঁজে বেড়াত।"[৪৯] কিন্তু ঢাকার রায়টে যেই মালতীর স্বামী নিহত হয়, মালতীর সব স্বপ্ন ভেঙে যায়। এরপর মালতীর জীবন নতুন খাতে বইতে শুরু করে। মালতীর জীবনে সংকট উপস্থিত হয়। মালতীর অন্তরের ইচ্ছাগুলি মালতীকে নতুনভাবে জীবনসংগ্রামের জন্য প্রেরণা দেয়। বৈধব্যের কারণে একাদশীর উপবাস নিয়ম মেনে করলেও আতাফুলের গন্ধ মালতীকে বিভোর করে তোলে। সামু টের পায় মালতী ক্রমে স্বামীর শোক ভুলে যাচ্ছে, আর মালতীকে অনুসরণ করলে মালতীও টের পায় তার শরীর থেকে আতাফুলের গন্ধ নিতে নিতে সামু তাকে অনুসরণ করছে। সময়ে অসময়ে তার ভিতর এক কোড়া পাখি ডেকে ওঠে : "শরীরে কী যে এক কোড়াপাখি আছে — সময়ে অসময়ে কেবল ডাকে, কোড়াপাখিটা ডেকে উঠতেই মালতীর গা কাঁটা দিল।"[৫০] মহাকাল সব দুঃখ মুছে দেয় কিন্তু মানুষের ভিতরে লুকনো ইচ্ছাগুলো অমর হয়ে থাকে। স্বামী-হারা দুঃখী মালতীর অস্তিত্বের মধ্যে নিহিত সেই মানবিক ইচ্ছাগুলি কোড়াপাখির রূপকে জেগে ওঠে। কোড়াপাখির ডুব্ ডুব্ শব্দের মত মালতীর হৃৎস্পন্দন মুক্ত আকাশ খোঁজে। দেশভাগের সমকালে রাজনৈতিক অস্থিরতার মধ্যেও ইচ্ছা-তাড়িত মানুষের জীবনান্বেষণ অব্যাহত থাকে। সদ্য বিধবা মালতী শোকে স্তব্ধ। তার সেই শোকের প্রশমন ঘটে বাল্যকালের সুখ-স্মৃতি মন্থনের মধ্য দিয়ে। শৈশবের সুখ স্মৃতিতে দিন কাটলেও তার পক্ষে রাত কাটানো দুষ্কর। মহাকাল মানুষের সব দুঃখে প্রলেপ দিয়ে যায়। দুঃখের স্মৃতি ভুলে মানুষের জীবনসংগ্রাম ও অন্বেষণ অব্যাহত থাকে। মালতীর ক্ষেত্রেও জীবনের সেই লীলা বিদ্যমান। মালতীর জীবনে মহাকালের সেই লীলা কীভাবে সঞ্চারিত হয় লেখক তার বর্ণনা এভাবে দিয়েছেন : "জানালা খোলা রেখে কেবল সাদা জ্যোৎস্নায় মাঠ দেখতে ভালোবাসে। মাঝে মাঝে সেই জ্যোৎস্নায় এক দানবের মতো মহাকাল — কি যে এক মহাকাল, কি যে তার মুখব্যাদান, রাঙা জবার লাখান চক্ষে ঠোঁট ব্যাদান কইরা রাখে — রাক্ষুসি এক তারে তাড়া কইরা মারে। ... ঘুমের ভিতর এক সুখপাখি মালতীর কেবল কাইন্দা কাইন্দা মরে — জলে নাও ভাসাও রে, আমারে লইয়া যাও বিলের জলে, ডুইবা মরি আন্ধাইরে।"[৫১] মালতীর অবচেতন মনের অন্ধকারে মানবিক ইচ্ছাগুলি পথ খোঁজে। মানুষের ভিতর এই অন্বেষণ সক্রিয় থাকে বলে স্বামীর মৃত্যুর দু'মাস

পরেই মুক্ত আকাশ আর এই ধরণীকে মালতীর প্রীতিময় মনে হয় : "দীর্ঘ দু'মাস পর মালতীর চোখ এই আকাশ এবং ধরণীকে প্রীতিময় ভেবে খুশি। ভোরে সেজন্য সামুকে চিৎকার করে ডাকতে পারল। কতকাল পর যেন সে এই মাটির মতো ফের সুজলা সুফলা অথবা যেন দুঃখের ভারে নিয়ত ভুগতে নেই।" [৫২] দুঃখের মুহূর্তগুলি জীবনের সবখানি জুড়ে থাকে না, দুঃখের মধ্যেও থাকে এক গূঢ় অন্বেষণ, এক শাশ্বত সংগ্রাম। সেই কারণেই বিধবা মালতী তার সব দুঃখ ভুলে স্বচ্ছ জলে নিজের প্রতিবিম্ব আর হাঁসের খেলা দেখে। তারপর তার মনে পড়ে বাল্যসঙ্গী রঞ্জিতের কথা — একদা যে তাকে কোনো এক অজানা গন্তব্যে নিয়ে যেতে চেয়েছিল।

বিধবা মালতীর জীবন থেকে স্বামী নামক ভালোবাসার মানুষটি হারিয়ে যায়, কিন্তু মালতীর ভালোবাসা হারিয়ে যায়নি। স্বামীর মৃত্যুর পর বৈধব্য যাপনের সময় মালতীর জিহ্বায় বেতের ডগা সেদ্ধ খাবার স্বাদ জেগে ওঠে, রঞ্জিতকে কেন্দ্র করে শৈশবের কিছু সুখ স্মৃতি জেগে ওঠে আর জলে সন্তরণরত হাঁসের খেলা দেখতে দেখতে সত্তায় নিহিত ইচ্ছাগুলিও ধীরে ধীরে জেগে উঠতে থাকে। রঞ্জিতকে আশ্রয় করে মালতীর জীবনে নতুনতর অন্বেষণ শুরু হয়। বাস্তুপূজার দিনে নানা কাজের ফাঁকেও তাই মালতী রঞ্জিতের অপেক্ষায় থাকে। সারাদিনের প্রতীক্ষার পর মালতী যখন রঞ্জিতের সাক্ষাৎ পায়নি, তখন সে তার স্বামীসহবাসের স্মৃতি মন্থনে উদ্যত হয়। কিন্তু সেই স্মৃতিও তার কাছে পুরনো বলে মনে হয়, বরং তার শরীর-মন তখন রঞ্জিত নামক এক যুবকের কল্পনায় অবশ এবং রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে। অন্ধকারের গোপন গভীরে মালতী তখন আত্মমৈথুনে লিপ্ত হয় অথবা তখন শুধু রঞ্জিতের ভালোবাসার জন্য এক মানবীর গোপন অভিসার শুরু হয়। মালতীর এই গোপন অভিসার তার জীবনান্বেষণের নামান্তর। এভাবে বিধবা মালতী গোপনে শরীরী মানবী হয়ে ওঠে। সমাজের ভাষায় মালতীর এই অন্বেষণ পাপের অন্বেষণ। সামাজিক নীতির নিরিখে লেখক যখন মালতীর এই রোমান্স-প্রিয়তার বর্ণনা দেন তখন তিনি লেখেন : "সতী সাবিত্রীর মতো পুণ্যবতী না হয়ে মনে মনে অন্ধকারের ভিতর রঞ্জিত নামক এক যুবকের স্মৃতিভারে আপন শরীরের ভিতর পাপকে অন্বেষণ করে বেড়াল — গোপনে সেই পাপকর্ম বড় ভালো লাগে।" [৫৩] কিন্তু এই ভালোবাসার অনুসন্ধান যে মানুষের জীবনে কী মহার্ঘ্য এবং বেঁচে থাকার পক্ষে যে তা কতটা অনিবার্য — সেদিকেই লেখকের দৃষ্টি যেন বেশি নিবদ্ধ — "তার এখন অসহায় আর্তনাদ এই শরীরের ভিতর। কী যেন নেই পৃথিবীতে, কী যেন তার হারিয়ে গেছে। সারা শরীরে এখন তার

ভালোবাসার অনুসন্ধান চলছে শুধু। কত আপন আর কত প্রিয় অনুসন্ধান। হায়, মানুষের অন্তরে এই ভালোবাসার ইচ্ছা কী করে হয়, কোন অন্ধকার থেকে সে উঁকি মারে, কখন সে সব পাপ-পুণ্য বিসর্জন দিয়ে মরমিয়া সন্ন্যাসিনীর মত পাগল-পারা হয় কেউ বলতে পারে না। মালতী ঘন ঘন শ্বাস ফেলছিল। বুঝি সেই এক বাউল শরীরে নৃত্য-গীত বাজায়, আমারে বাজাও তুমি রসের অঙ্গুলি দিয়া। তারপর কোড়াপাখির ডাকের মতো শব্দ ডুব্ ডুব্।"[৫৪] জীবনের এই অন্বেষণই মালতীর বেঁচে থাকার পক্ষে জরুরি এক অবলম্বন হয়ে ওঠে। এই জীবনান্বেষণই মালতীর জীবনসংগ্রামের মৌল প্রেরণা হয়ে ওঠে। স্বামীর শোকে বাক্যহীনা মালতী রঞ্জিতের ভালোবাসা পাবার আশায় আবার কথা বলতে শুরু করে। কিন্তু জব্বর ও তার দলবল কর্তৃক অপহৃতা ও ধর্ষিতা মালতীর আবার মনে হয় তার পক্ষে মৃত্যুবরণ করাই শ্রেয় : "নানা, আমি কোথায় যাব! কার কাছে যাব! আমি যেদিকে দুচোখ যায় চলে যাব জোটন। আমি জলে ডুবে মরে যাব।"[৫৫] মালতীর মনে হয় তার শুচিতা বিনষ্ট হয়েছে, তাই সে তার কাঙিক্ষতের কাছে আর যেতে পারবে না। সেজন্য মালতী আবার মৃত্যু কামনা করে। কিন্তু মালতীর এই মৃত্যু কামনা সাময়িক ভ্রান্তি, আসলে সে জীবনের যে কোনো অবস্থাতেই বেঁচে থাকতে চায়।

ধর্ষিতা মালতী বাড়ি ফিরে সারাদিন শুধু জলে ডুবে থাকতে চায়। জলে নামলে মালতীর মনে হয় তার শরীরের সব পাপ ধুয়ে যাচ্ছে। এভাবে মালতী তার শরীরের সব পাপ ধুয়ে জীবনের আহ্বানে সাড়া দেয়। সারাদিন সে জলে ডুবে থাকতে ভালোবাসত। সে জলে উদ্‌বেড়ালের মতো ডুবত-ভাসত। ছেলের দল তাই দেখে ঠাট্টা-তামাশা করত। মালতীর এই মরণখেলার মধ্যে লেখক জীবনের এক অমোঘ সত্যের আবিষ্কার করেন। মালতী সারাক্ষণ জলে ডুবে থাকতে চাইলেও সবকিছু তার জলে ডুবে থাকে না, তার আঁচল জলের উপর ভেসে ওঠে, তার পায়ের পাতা দেখা যায়। ছেলেদের এসব কথা শুনে মালতীর যে প্রতিক্রিয়া হত, লেখক তার বর্ণনা দেন : "এমন যখন বলত বালকেরা, তখন মালতীর কী করুণ মুখ! আমার সব তবে ডোবে না, আমার কিছু-না কিছু ভাইসা থাকে!"[৫৬] জীবনের ধর্মই এমন। বেঁচে থাকার অমোঘ আকর্ষণে মানুষ অগাধ সংসার-সলিলে সর্বদা ভেসে থাকতে চায়। বেঁচে থাকার সেই অমোঘ আকর্ষণেই মালতী সহায়সম্বলহীন এবং অপবিত্র জীবন নিয়েও সংসার-সলিলে সর্বদা ভেসে থাকে।

কেবল চিত্রকল্পের অভেদ্য প্রয়োগ নয়, ইতিহাসের কালানুক্রমও লেখক ব্যবহার করেন

সুচারুভাবে। সোনা স্কুলে যেতে শুরু করেছে। তখন তার শৈশব কৈশোরের সন্ধিকাল — "সেই প্রথম এ অঞ্চলের উপর দিয়ে উড়োজাহাজ উড়ে যাচ্ছে। ঢাকার কাছে কর্মিটোলাতে যুদ্ধের ঘাঁটি হয়েছে। মেজ-জেঠামশাই বাড়ি এলে যুদ্ধের গল্প করেন"[৫৭] এভাবে লেখক দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়কালকে চিহ্নিত করেন। সোনা, লালটু, পলটু ফতিমা, অমলা, কমলা — এই নতুন প্রজন্মের মানুষেরা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের দিনগুলিতে ধীরে ধীরে বড় হচ্ছে। ঔপনিবেশিক ভারতে মুসলিম লীগের আন্দোলন দ্রুত দানা বাঁধছে। দু-একটি ছোটোখাটো দাঙ্গা ইতিমধ্যেই ঘটে গেছে। ঢাকার দাঙ্গায় মালতীর স্বামী নিহত হয়েছিল, বান্নির মেলার দাঙ্গায় লুটতরাজ ও নারী অপহরণের ঘটনাও ঘটে। পুরনো মন্দির-মসজিদের আবিষ্কার করে — তাকে কেন্দ্র করে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সংঘটিত হয়। আনন্দময়ী কালীবাড়ির পাশে ভাঙা অট্টালিকাকে মসজিদ ভেবে তাতে নামাজ পড়াকে কেন্দ্র করে চরে বীভৎস দাঙ্গা সংঘটিত হয়েছিল। ফেলু সেই দাঙ্গায় গুলিবিদ্ধ হয়। লেখক এভাবে বৃহত্তর রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটকে সাল তারিখের উল্লেখ না করেও চিহ্নিত করেন। তিনি দেখান যে, এইসব বৃহত্তর রাজনৈতিক তরঙ্গে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মানুষের জীবনও কীভাবে আন্দোলিত হয়।

দাঙ্গায় স্বামীর মৃত্যুর পর প্রাথমিকভাবে মালতীর মনে হয়েছিল জীবন নিরর্থক। তখন রঞ্জিতের সংস্পর্শে মালতী আবার বেঁচে থাকার অবলম্বন খুঁজে পায়। দ্বিতীয়বার সাম্প্রদায়িক হিংসায় জব্বর কর্তৃক ধর্ষণের ফলে মালতীর মনে হয় তার পক্ষে জলে ডুবে মরাই শ্রেয়। কিন্তু তখনও রঞ্জিতের সহানুভূতির স্পর্শে মালতী বেঁচে থাকার প্রেরণা পায়। ধর্ষিতা মালতীকে ফকিরসাব ও জোটন মানবিক কর্তব্যবোধের ফলে উদ্ধার ও শুশ্রূষা করেছিল, কিন্তু নরেন দাস ধর্মীয় ও সামাজিক কারণে তাকে উদারভাবে গৃহে স্থান দিতে পারেনি। সেই অপমানে মালতী পুনরায় আত্মহত্যার চেষ্টা করে। রঞ্জিত মালতীর এই আত্মহত্যার প্রচেষ্টার জন্য নরেন দাস অথবা জব্বরকে দায়ি করে : "ওর মনে হল নরেন দাসই এই আত্মহত্যার জন্য দায়ী। নরেন দাস তাকে একটা খুপ্‌রিতে রেখে দিয়েছিল। অথবা সেই জব্বর।"[৫৮] স্বদেশ প্রেমিক রঞ্জিতের এই অনুভব মানবিক, তাই সে অপেক্ষায় থাকে মালতী কখন আবার প্রাণ ফিরে পাবে। চারিদিকে হিংসা আর পাপের ছড়াছড়ি, তখন মালতীর মত অসহায় নারীর আশ্রয় পবিত্র জল ছাড়া আর কী থাকতে পারে। লেখক তখন বিবৃতি দেন : "বস্তুত এই জলাজমির দেশে মাটি আর মানুষ জলাজমির নিচে আশ্রয় খোঁজে। মালতী প্রাণ ধারণের কোনও আর উৎসাহ পাচ্ছে না। জলের নিচে তার সেই প্রিয় নিরুদ্দিষ্ট হাঁসটিকে খোঁজার জন্য বুঝি ডুব দিয়েছিল। আমি

আর ভাসব না জলে, জলের নিচে ডুবে যাব, এই ছিল তার আশা।"[৫৯] মালতী জলের নিচে আসলে তার বেঁচে থাকার অবলম্বন খোঁজে। মালতী সেই অবলম্বন কখনও পায় তার প্রিয় হাঁসগুলির মধ্যে কখনও রঞ্জিতের মধ্যে। যে মালতী আত্মহত্যার উপায় খোঁজে, সেই মালতীই আবার রঞ্জিতকে জানায় : "আমি মরতে চাই না ঠাকুর। বিশ্বাস কর, আমি মরতে চাই না। তুমি কাছে থাকলে আমি মরতে পর্যন্ত সাহস পাই না।"[৬০] আসলে মালতী মরতে চায় না, সে শুধু সামাজিকভাবে বন্দি জীবন থেকে মুক্তি পেতে চায়।

রঞ্জিত নামক এক যুবককে মালতী তার বেঁচে থাকার অবলম্বন ও আশ্রয় ভাবতে ভালোবাসে। কিন্তু রঞ্জিত তা বোঝে না। রঞ্জিতের জীবনসংগ্রাম ভিন্ন সুরে বাধা। সে এক স্বদেশী যুবক। সে দেশোদ্ধারের মহান ব্রতে নিয়োজিত, মালতীর মতো এক সামান্য বিধবার মূল্য তার কাছে সামান্যই। তাই মালতীর জন্য সে বাঁধা পড়তে চায় না। রঞ্জিতের এই কঠোর মনোভাবে আহত মালতী শেষবারের মতো অনুরোধ করে — "ঠাকুর আমি মরতে চাই না। তুমি আমাকে কোথাও নিয়ে চল।"[৬১] কিন্তু দেশ প্রেমের অহমিকায় রঞ্জিত এক মহান আদর্শের উচ্চতায় বিরাজমান — "তার সামনে কতবড় মাঠ, শস্য ক্ষেত্র। সে সামান্য ফসলের জমি নিয়ে কী করবে! মালতীকে সে কোথাও পৌঁছে দিতে পারছে না। এই নিয়তি মালতীর।"[৬২] রঞ্জিত দেশপ্রেমের জন্য মালতীকে উপেক্ষা করে, কিন্তু দেশপ্রেমের অর্থ যে শুধু বিদেশী শাসক-হত্যা নয় — দেশপ্রেমের প্রকৃত অর্থ হল মাটি ও মানুষের মেলবন্ধন ঘটানো। রঞ্জিত এই সহজ সত্যটি ভুলে যেতে বসেছে। রঞ্জিতের মতো স্বদেশীরা শুধু দেশের মাটিকেই চেনে, মানুষকে চেনে না। তাই শশী মাস্টার যখন রঞ্জিতকে তাঁর আয়ুর্বেদের খাতা খুলে দেখান, তখন রঞ্জিত শশী মাস্টারকে বলে — "দেশের মাটিতে যা হয়, পৃথিবীর কোথাও তা পাওয়া যায় না।"[৬৩] রঞ্জিত শুধু দেশের মাটিকে চেনে এবং ভালোবাসে। কিন্তু দেশ মানে তো শুধু মাটি নয়, মানুষও — এ ধারণা রঞ্জিতের পূর্ণ হয়ে ওঠে না। রঞ্জিতের লক্ষ্য এই দেশপ্রেম। লেখক মালতীর উক্তিতে রঞ্জিতের এই দেশপ্রেমের ফাঁকি দেখিয়েছেন : "ঠাকুর তুমি আমাকে কার কাছে রেখে গেলা? তুমি দেশের কাজ করে বেড়াও আমি কি তোমার দেশ না? তোমার এই জলা-জমি অথবা মাটিতে আমি বড় হয়ে উঠি না! আমার সুখ-দুঃখ তোমার সুখ-দুঃখ না!"[৬৪] এভাবে দেশের এক অসহায় নারীর আর্তি যেন দেশের সমস্ত নারীর কণ্ঠস্বর হয়ে ধ্বনিত হয়। মালতীর এই করুণ আর্তনাদে রঞ্জিতের ভুল ভেঙে যায় — "সে আর পা বাড়াতে পারল না। মনে মনে সে আজ কখনও জীবনে যা ভাবেনি, যা-কিছু স্বপ্ন ছিল তা মিথ্যা প্রতিপন্ন করে অন্য জীবনে

ঝাঁপিয়ে পড়বে ভাবল। দেশ উদ্ধারের চেয়ে কাজটা কেন জানি কিছুতেই কম মহৎ মনে হচ্ছে না।''[৬৫] অন্ধকারে জালালির কবর রঞ্জিতের দৃষ্টিকে আরো প্রসারিত করল। রঞ্জিতের মনে হল : ''বেঁচে থাকার জন্য আপ্রাণ জীবনসংগ্রাম ছিল জালালির। মৃত্যুর পর একখণ্ড ভূমি পেয়ে সে এখন কী মনোরম হাসছে। জালালি তার নতুন এই ভূ-খণ্ডে এখন কাশফুল হয়ে বেঁচে আছে।''[৬৬] অন্ধকারে দাঁড়িয়ে রঞ্জিতের মনে হল, এই ভূ-খণ্ড সকলের প্রাপ্য। রঞ্জিত মনে মনে ভাবে : ''... এই একখণ্ড জমি সকলের প্রাপ্য। সবাইকে এই দিতে হবে। অভুক্ত এবং ভূমিহীন মানুষ, ভূমিহীন বলতে পায়ের নিচে মাটি নেই এমন মানুষ সে ভাবতে পারে না। তার ঘর থাকবে, চাষ-আবাদের জমি থাকবে, সে কিছু খাবে, খেতে পাবে, খেতে না পেলে মানুষের স্বাধীনতার অর্থ হয় না। মানুষের স্বাধীনতা বলতে সে এই বোঝে। তার কেন জানি এবার মনে হল, সে একখণ্ড জমি মালতীকেও দেবে।''[৬৭] এভাবে রঞ্জিতের ভাবান্তর ঘটে। অতঃপর রঞ্জিত মালতীকে সঙ্গী করেই দেশোদ্ধারে ব্রতী হয়।

দেশভাগের পর মালতী পশ্চিমবঙ্গে চলে এসেছিল। জীবনে মালতী কতবার মৃত্যু-সংকল্প করেছে, কিন্তু রঞ্জিতকে মালতী জানিয়েছিল — সেও সকলের মত বাঁচতে চায়। তাই পশ্চিমবঙ্গে এসে মালতী বাঁচার তাগিদেই চাল পাচারকারীদের দলে যুক্ত হয়। স্বামীর মৃত্যুর পর মালতী বৈধব্য যাপন করেছে, ধর্ষণের পর নিজেকে পাপমুক্ত করার জন্য মালতী আত্মহত্যার চেষ্টা করেছে, ধর্ষণজাত অবৈধ সন্তানকে গর্ভপাতের মধ্য দিয়ে বিনষ্ট করেছে এবং তারপরও মালতী নিজেকে কখনও অসতী ভাবেনি। মালতী রঞ্জিত নামক এক স্বদেশী যুবকের জন্য হৃদয়ে স্বর্ণসিংহাসন পেতে রেখেছিল। দেশভাগের পর মালতীর সেই আশাও বিচূর্ণ হয়ে যায়। দেশভাগের পর পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে মালতী একজন চাল পাচারকারী রিফিউজি ছাড়া আর কিছু নয়। উদ্বাস্তু জীবনে মালতীর পুরনো সংস্কারও ভেঙে যায়। শারীরিক শুচিতা রক্ষা করা মালতীর পক্ষে তখন বড় বেশি জরুরি নয় — বেঁচে থাকাই তার কাছে সবচেয়ে বড়। তাই চাল পাচার করার সময় ছদ্মবেশী দারোগাকে আপাতভাবে ইজ্জত দিতেও সে প্রস্তুত ছিল। অথচ মালতী যখন ধর্ষিতা হয়েছিল, তখন তার নিজেকে অসতী মনে হয়নি — এবারে মালতী নিজেকে প্রথম অসতী মনে করে। গর্ভবতী কুসুম ও তার চালটুকু বাঁচানোর জন্য মালতী স্বেচ্ছায় সেই দারোগাকে আহ্বান করে। এভাবে পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে শুধু প্রাণ ধারণের জন্য মালতী অসতী হয়ে যায় — ''শালের বন এবং শস্যহীন এই প্রান্তরে সিংহের খেলা দেখানো বাকি এমন এক চোখের বেদনা টপ টপ করে এই প্রথম অসতী হবার জন্য চোখের জল

ফেলছিল।''[৬৮] এভাবে বেঁচে থাকার জন্য মালতী শারীরিক শুচিতার পুরনো ধারণাকে চোখের জলে বিদায় জানায়। মালতী তার সংস্কার ভেঙে বেঁচে থাকার সংগ্রামে নারীর শেষ সম্বলও পণ করতে প্রস্তুত হয়। অবিভক্ত বাংলাদেশের মালতী যা পারেনি, বহু মানুষের প্রতীক্ষিত দেশভাগের পর মালতী তা করতে পারে। মানুষের বেঁচে থাকার সংগ্রাম এভাবেই নানা ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে নানারূপে প্রবহমান থাকে। রাজনৈতিক ও আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপট পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের চিরাচরিত সংস্কারগুলি ভেঙে যায়, কিন্তু পরিবর্তিত জীবনের প্রেক্ষাপটে মানুষের জীবনসংগ্রাম নিরন্তর চলতে থাকে। মানুষের অন্তর্নিহিত ইচ্ছাশক্তি শেষ পর্যন্ত মানুষকে সংগ্রামী করে রাখে। জীবনের এই শাশ্বত বাণী 'নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে' উপন্যাসের চরিত্রগুলির মধ্য দিয়ে লেখক রূপায়িত করেছেন।

'নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে' উপন্যাসে ১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সুদীর্ঘ সময়ের প্রেক্ষাপট ব্যবহৃত হয়েছে। এই সুদীর্ঘ প্রেক্ষাপট জুড়ে রয়েছে চরমপন্থী স্বদেশীদের রাজনৈতিক কার্যকলাপ, নেতাজীর 'আজাদ হিন্দ্ বাহিনী'র উত্থান, গান্ধিজির নেতৃত্বে জাতীয় কংগ্রেসের 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলন, মুসলিম লীগের উগ্র সাম্প্রদায়িকতা এবং সর্বোপরি স্বাধীনতা প্রত্যার্পণের পূর্বে ব্রিটিশ সরকারের সাম্প্রদায়িক উষ্কানি ও ষড়যন্ত্র। 'নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে' উপন্যাসে ব্যক্তি মানুষ কীভাবে উক্ত রাজনৈতিক তরঙ্গমালার শরিক হয়ে ওঠে এবং সেই সঙ্গে আত্মিক সংকটে বিপর্যস্ত হয় — তার চিত্রও পাওয়া যায়। শুধু তাই নয়, লেখক দেখিয়েছেন, ব্যক্তি মানুষ রাজনৈতিক তরঙ্গমালার মধ্যে আবর্তিত হয়েও শেষ পর্যন্ত কীভাবে প্রবহমান জীবনসংগ্রাম ও জীবনান্বেষণের শরিক হয়।

স্বদেশী যুবক রঞ্জিতের সংগ্রাম দেশের — স্বাধীনতার জন্য। সেজন্য সে অনুশীলন সমিতির সদস্য। দেশের সংকটকালে মানুষকে আত্মবিশ্বাসী করে তোলার জন্য সে সমিতির নির্দেশে বিভিন্ন স্থানে গোপনে মানুষকে লাঠিখেলা ও অসি বিদ্যা শেখায়। কিন্তু বাস্তবে রঞ্জিতের এই কাজ শুধু হিন্দুদের জন্য সীমাবদ্ধ। মুসলমানদের প্রতি সে উদারতা দেখাতে পারে না। লীগের নেতা সামুর কার্যকলাপকে সে সন্দেহের চোখে দেখে। রঞ্জিত মনে করে হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে পরস্পর নির্ভরতার দিন শেষ হয়ে গেছে। সামুর মতো লীগের নেতারা তখন মুসলমান গ্রামে মজলিসে মজলিসে হিন্দু-বিদ্বেষী ভাষণ দিয়ে বেরাচ্ছে। স্বদেশী যুবক রঞ্জিত টের পায় সেই সময়ে বাংলার হিন্দু-মুসলমানরা দুই বিপরীত শিবিরে একত্রিত হচ্ছে। রঞ্জিত গ্রামে এসে এও বুঝতে পারে যে, সামু যেখানে মজলিসে মহাভোজের ব্যবস্থা করে, সেই

গ্রামের জালালি ক্ষুধা-নিবৃত্তির জন্য শালুক তুলতে গিয়ে জলে ডুবে মরে যায়। রঞ্জিত অনুভব করে : "... এবং এই মৃত্যু, জালালির জলে ডুবে মরা প্রায় জীবন-সংগ্রামের জন্য বলা যায়। শালুক তুলতে গিয়ে জালালি পদ্মপাতায় আটকে মরে গেল। বোধহয় রঞ্জিতকে মানুষে মানুষে এই বৈষম্যও পীড়িত করছিল। সে সমিতিকে এইসব লিখেও জানাবে ভাবল।" ৬৯ মানুষ যেখানে ক্ষুধা-নিবৃত্তির জন্য শালুক তুলতে গিয়ে জলে ডুবে মরে সেখানে দেশভাগ কতটা সঙ্গত, বোধহয় এই প্রশ্নের মুখোমুখি বিপ্লবী রঞ্জিত। অন্যদিকে দাঙ্গার শিকার মালতী। মালতীর স্বামী দাঙ্গায় প্রাণ হারায়। সাম্প্রদায়িক হিংসার পরিণতিতে সে জব্বর ও তার দলবলের দ্বারা ধর্ষিতা হয়। তারপরও এই মালতী যখন বাঁচার স্বপ্ন দেখে, তখন রঞ্জিতের আদর্শ-নির্ভর দেশপ্রেমের ধারণার পরিবর্তন ঘটে। রঞ্জিত বুঝতে পারে, দেশ মানে শুধু মাটি নয়, মাটি ও মানুষের মেলবন্ধন। রঞ্জিতের দেশপ্রেমের দারণার এভাবে রূপান্তর ঘটে। রঞ্জিত মালতীকে সঙ্গে নিয়েই তার লক্ষ্যের অভিমুখে অগ্রসর হয়।

উপন্যাসে সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমান জনসাধারণের দুঃখ-দারিদ্র্যের কথা লেখক পক্ষপাতহীন ভাবে বর্ণনা করেছেন। লেখক সেই দুঃখ-দারিদ্র্যের নির্মম নির্লিপ্ত বর্ণনা দিয়েছেন : "গ্রামের মুসলমান বিবিরা পাগল ঠাকুরকে দেখে পলকে ঘরে নিজেদের আড়াল করে দিচ্ছে। ওরা বড় নিঃস্ব। সুতরাং শরীরে পর্যাপ্ত আবরণ নেই।" ৭০ জালালি এক কাপড়েই দিনযাপন করে। লোকসমাজের আড়ালে সে নগ্ন থাকতে অভ্যস্ত। শচীন্দ্রনাথ মুসলমান পাড়ায় গিয়ে বুঝতে পারে না কোনটা কার ঘর। এমনিতেই এইসব মানুষের অবস্থা শোচনীয়, উপরন্তু এদের উপর চলে সামাজিক শোষণ। মনজুরের সামান্য জমিটুকুও কেড়ে নেয় অবস্থাপন্ন হাজিসাহেবের ছেলেরা। ফেলু শেখের আর্থিক দৈন্য এবং শারীরিক অসুস্থতার সুযোগ নিয়ে আকালু তার শেষ সম্বল আন্নু বিবিকে হস্তগত করে। সুতরাং শুধু অবস্থাপন্ন হিন্দুদের দ্বারা মুসলমানরা শোষিত — এমন নয়, জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে গরিব মানুষেরা শোষিত, এটাই প্রকৃত সত্য। জালালির মতো শালুক তুলতে গিয়ে বুড়ি, রসো — এরাও ফাওসার বিলে ডুবে মরে। দেশভাগ হয়ে গেলে ইসলাম রাষ্ট্র পূর্ব-পাকিস্তানে ঈশম শেখ নিজেকে প্রথম ভূমিহীন আশ্রয়হীন ভাবে। অবিভক্ত বাংলাদেশের এই আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপটেই লীগের নেতা সামসুদ্দিন মুসলমানদের জন্য আলাদা রাষ্ট্রের দাবিতে সোচ্চার হয়। রঞ্জিত গুপ্ত সমিতির নাম করে স্বাধীনতার জন্য ব্যক্তি হত্যার রাজনীতিতে অংশ নেয়। শচীন্দ্রনাথ সভায় বক্তৃতা দেয় : "আমরা এক অখণ্ড দেশ চাই। সে দেশের নাম ভারতবর্ষ। এক দেশ, এক জাতি, হিন্দু মুসলমানের এক পরিচয়,

আমরা ভারতবাসী।" [৭১] — এই বক্তৃতা শুনে মাঠের দূরবর্তী কোণে আকালুদ্দিন তাচ্ছিল্যের হাসি হেসে বলে — "এক জাতি, এক পরিচয় — আমরা ভারতবাসী!" [৭২] আকালুর এই তাচ্ছিল্যের হাসিতে শুধুই সমকালীন হিন্দু বিদ্বেষ ছিল তা নয়, এর পিছনে ছিল নিত্যদিনের জীবন যাপনে মুসলমানদের প্রতি হিন্দুদের অস্পৃশ্যতার প্রতিবাদ। এই নির্মম সামাজিক সত্যটি নিরক্ষর মানুষ আকালুর আচরণের মাধ্যমে ঔপন্যাসিক উপস্থাপন করেছেন।

দেশভাগ যখন প্রায় অবশ্যম্ভাবী সেই সময়েও কিছু মানুষ (মূলত হিন্দু) অখণ্ড ভারতবর্ষের স্বাধীনতার জন্য স্বপ্ন-বিভোর হয়েছিলেন। রঞ্জিত, শচীন্দ্রনাথ, শশীমাস্টার সেই দলের মানুষ। রঞ্জিতকে দেশদ্রোহিতার অপরাধে ধরতে এসে তাকে না পেয়ে শচীন্দ্রনাথকে পুলিশ যখন ধরে নিয়ে যাচ্ছিল, তখন শশীমাস্টার সোনাকে প্রবোধ দিয়েছেন : "দূর বোকা, কাঁদে নাকি! কত বড় সম্মান! দেশের কাজ করছে বলে ধরে নিয়ে যাচ্ছে। আমাদের দেশ স্বাধীন হবে। আমাদের কোনও দুঃখ থাকবে না। কত সম্পদ আমাদের। সব ইংরেজরা এখন সাগর পাড়ে নিয়ে যাচ্ছে। ওদের তাড়িয়ে দিলে কোনও মানুষ না খেয়ে থাকবে না। দুর্ভিক্ষে মানুষ মারা যাবে না। আমাদের দেশ কত বড়, আর কী মহান এই দেশ। আমরা এই মহান দেশের মানুষ। আমাদের গর্বের শেষ নেই।" [৭৩] ছোট্ট সোনার মন ভরে ওঠে।

হিন্দুরা যখন অখণ্ড ভারতবর্ষের স্বাধীনতার স্বপ্নে বিভোর, সেই সময়ে মুসলিম লীগ ধর্মের ভিত্তিতে দেশভাগের জন্য মরিয়া হয়ে ওঠে। 'নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে' উপন্যাসে লীগের নেতা সামসুদ্দিন ওরফে সামুর স্বপ্ন মুসলমান ভাইদের জন্য স্বাধীন ইসলাম রাষ্ট্র গঠন করা। তার ধারণা মুসলমানদের জন্য আলাদা রাষ্ট্র গঠিত হলেই তাদের আর কোনো দুঃখ থাকবে না। সামু তাই ঢাকা থেকে গ্রামে এসে লীগের অফিস খোলে এবং মজলিসে মজলিসে মুসলমানদের একত্রিত করে পাকিস্তানের দাবির পক্ষে সোচ্চার হয়। কোনো রাজনৈতিক মতাদর্শ নয়, বুভুক্ষু মানুষের ধর্মীয় আবেগই তার রাজনীতির হাতিয়ার। শচীন্দ্রনাথের মতো উদার জাতীয়তাবাদী কংগ্রেস নেতা তাই সামুর প্রতি সন্দেহ প্রকাশ করে। সামুর আয়োজিত মজলিসের পাশে বুভুক্ষু জালালি ঘুরে বেরায় আর আকালুদ্দিনের মতো লোভী ও ধূর্ত মানুষেরা তার পার্শ্বচর হয়ে ওঠে।

সামসুদ্দিনের লক্ষ্য পাকিস্তান গঠন করা। সে সর্বদা সেই লক্ষ্যের অভিমুখেই ধাবিত হয়েছে। তবে, সামসুদ্দিনের রাজনৈতিক লক্ষ্যের সঙ্গে ব্যক্তি মানুষের সামাজিক অস্তিত্বের দ্বন্দ্বকে সুচারুরূপে অঙ্কন করে লেখক সামসুদ্দিনকেও মানবিক সত্তা দান করেছেন। লীগের সভায় সামসুদ্দিন হিন্দু-বিরোধী বক্তৃতা দেয়, কিন্তু ঝড়-জলের রাতে পাগল ঠাকুর নিরুদ্দেশ

হয়ে গেলে সেও শচীন্দ্রনাথের সঙ্গে পাগল ঠাকুরকে খুঁজতে বের হয়। পাগল মানুষ মণীন্দ্রনাথের প্রতি সামসুদ্দিনের মনে মানবিক দায়িত্ববোধের জাগরণ ঘটে। লীগের হয়ে দেশভাগের জন্য আন্দোলন করছে বলে সামুর মনে অপরাধ বোধ জেগে ওঠে। মালতীর জন্যও সামু দুঃখবোধ করে, কারণ হিন্দু-মুসলমানের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় মালতীর স্বামী নিহত হয়েছে। কিন্তু তবুও সামু গাছে গাছে লীগের ইস্তাহার ঝোলায়। মালতীর বৈধব্য তাকে লক্ষ্যভ্রষ্ট করতে পারে না আবার একই সঙ্গে সামুর মানবিক সত্তাও জেগে ওঠে। নরেন দাসের গাছে ইস্তাহার ঝোলালে মালতী প্রতিবাদ জানায়। মালতী রাগ প্রকাশ করে, কিন্তু — "সামু মালতীর এই রাগ দেখে মনে মনে হাসল। মালতী আগের মতই জেদী একগুঁয়ে। কিন্তু মনের ভিতর কী এক শপথ সব সময় কাজ করছে। গাঁয়ে উঠে যাবার সময় ওর চোখ মুখ দৃঢ় দেখাল। অথচ গাঁয়ের সবুজ বনঝোপ দেখে মনটা আর্দ্র হয়ে উঠছে। মালতীর শস্যদানার মতো শরীরের রঙ — তাছাড়া শৈশবের কিছু কিছু প্রীতিপূর্ণ ঘটনা, স্বামীর সাম্প্রদায়িক মৃত্যু এবং বৈধব্যবেশ, সব মিলে মনে এক অপার বেদনা সঞ্চার করছে সামুর। এই উগ্র জাতীয়তাবোধ ওর ভাল লাগল না। সে ছুটতে থাকল। সে আর হিজল গাছে ইস্তাহার ঝোলাবে না, অন্য কোনখানে গিয়ে ইস্তাহারটা টাঙিয়ে দেবে।" [৭৪] সামুর মধ্যে এভাবে রাজনৈতিক লক্ষ্য এবং সামাজিক-মানবিক সত্তার দ্বন্দ্ব লেখক অঙ্কন করেছেন। মালতীর বৈধব্য, জালালির দারিদ্র্য এবং সমগ্র মুসলমান জনগোষ্ঠীর দুরবস্থার জন্য সামু পীড়িত বোধ করলেও সাম্প্রদায়িক রাজনীতি থেকে স'রে দাঁড়ায় না। যেসমস্ত শোষিত মানুষের প্রতি সামু দুঃখ অনুভব করে, তাদের দুঃখ-দুর্দশার মূল কারণ যে ঔপনিবেশিক শাসন-কাঠামোর মধ্যে নিহিত — সে সত্য সামুর উপলব্ধিতেই ধরা দেয় না। তাই সে হিন্দুদেরই মুসলমান সম্প্রদায়ের প্রতিপক্ষ ভাবে। তাই সে মালতীর উদ্দেশে বলে : "একবার চোখ তুইল্যা দ্যাখ, চাকরি তগ, জমি তগ, জমিদারী তগ। শিক্ষাদীক্ষা সব হিন্দুদের।" [৭৫] সামু এভাবে ভুল পথে মুসলমান ধর্মাবলম্বী মানুষের জন্য দেশভাগের স্বপ্নে বিভোর হয়।

প্রথম থেকেই সামসুদ্দিন প্রতারণা ও হিংসার পথে মুসলিম রাষ্ট্র গঠনে তৎপর হয়েছে। এরই প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে সে জলসার আয়োজন করে। আর্থিকভাবে বঞ্চিত, দুস্থ, বুভুক্ষু মানুষকে খাবারের প্রলোভন দেখিয়ে সে তার লীগের শক্তি বৃদ্ধি করতে চায়। সে আবেদালির ছেলে জব্বরের মনে হিন্দুদের প্রতিহিংসার আগুন জ্বালিয়ে দেয়। আবেদালি যখন জব্বারের কাছে জানতে চায় যে জলসায় কী হচ্ছিল, তখন উত্তেজিত জব্বর বলে : " — কী হইব আবার। হিন্দুরা আমাগ দ্যাখলে ছ্যাপ ফালায়, আমরা-অ ছ্যাপ ফ্যালামু।" [৭৬] একদা আজাদের

ভক্ত সামু সময়ের পরিবর্তনে লীগের পান্ডা! জাতীয় মুক্তির পথ ছেড়ে সামু সংকীর্ণ ধর্মীয় জাত-পাত-ভিত্তিক রাজনীতির আশ্রয় গ্রহণ করে। তাই সে হিন্দু নরেন দাসের হিজল গাছে লীগের ইস্তাহার ঝোলায় এবং ইস্তাহার ঝোলানোর পর সে নরেন দাসের উঠোন মাড়িয়ে চলে যায়। সামু এভাবে হিন্দুদের প্রতি মুসলমান সম্প্রদায়ের মনে হিংসা জাগিয়ে তোলে। তারই প্রশ্রয়ে আকালুদ্দিন জনসভায় উত্তেজক ভাষণ দিয়ে সাম্প্রদায়িক উন্মাদনা সৃষ্টি করে। আকালুদ্দিন প্রকৃতপক্ষে স্বার্থান্বেষী মানুষ। লেখক বর্ণনা দেন : "গায়ে কাঁটা দেয়, যখন আকলুদ্দিন বলে, দ্যাখেন মিঞারা চক্ষু তুইলা দ্যাখেন! কি আছেডা আপনেগ! খানা নাই, পিনা নাই, জানে নাই খুন, হিন্দুরা সব চুরি কইরা নিছে।" ৭৭ এভাবে সামুর নির্দেশিত ভুল পথে এগিয়ে চলে ধর্মান্ধ এবং স্বার্থান্বেষী মানুষ। আকালুদ্দিন সভায় উত্তেজক বক্তৃতা দেয় এবং গোপনে ফেলুর একমাত্র অবলম্বন আন্নু বিবির তালাকের চক্রান্তে সক্রিয় হয়।

সামুর এইসব রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপের জেরেই তার শৈশবের দিনগুলি হারিয়ে যেতে থাকে। তার ইসলামিক রাষ্ট্র গঠনের বলি হয় তারই বাল্যসঙ্গী মালতীর দাম্পত্যজীবন। আবার সেইসঙ্গে বাংলার ঘাস-মাটি-জলের জন্য এবং বিশুদ্ধ ইসলাম প্রীতির জন্য তার হৃদয়ের অরণ্যে হারিয়ে যেতে ইচ্ছা হয়। সে দেখে মুশকিল আসানের লম্ফ হাতে ফকিরসাব প্রকৃত ধর্মের পথে এগিয়ে চলেছে। সামু তাকে বার বার ডেকেও ফেরাতে পারছে না। ফকিরসাব তাঁকে অনুসরণ করতে বলছেন। অথচ সামু ফকিরসাবের বিপরীত কাজটিই করে চলেছে, তাই তার হৃদয় বার বার ক্ষতবিক্ষত হয়। এভাবে লেখক ব্যক্তি মানুষের হৃদয়ের দ্বন্দ্বের চিত্র এঁকেছেন।

সামসুদ্দিন পাকিস্তান গঠনের লক্ষ্যে সফল হয়, কিন্তু সে তার স্বপ্নের পাকিস্তান পায় না। তার স্বপ্ন অচিরেই বর্ণহীন হয়ে যায়। সামসুদ্দিনের স্বপ্নের পাকিস্তানের ভাবী নেতা আকালুদ্দিন মনজুরের সামান্য জমিটুকুও কেড়ে নেয়। দেশভাগের ফলে ঠাকুর পরিবারের মানুষগুলি যখন তাদের জমি হস্তান্তর করে, তখন ঈশম শেখ তার প্রাণের তরমুজের খেত থেকে উৎখাত হয় : "নির্জন রাত্রির অন্ধকারে বসে ঈশম সব টের পাচ্ছে। কিছুই পরিবর্তন হয়নি। কেবল সে নিজে কীভাবে প্রথম ভূমিহীন হয়ে গেল! সে যে এতদিন ভূমিহীন ছিল টেরই পায়নি। আজ প্রথম জমির আলে ওর সেই প্রিয় ছই পড়ে থাকতে দেখে ভাবল, তার সব গেছে। সে সবকিছু হারিয়েছে।" ৭৮ দেশভাগ হয়ে গেলে সামসুদ্দিনের সেই খণ্ডিত দেশে এভাবে মানুষ নিরাশ্রয় হয়। দেশভাগের পরও তো মানুষ আশ্রয়হীন হচ্ছে, মানুষ ভূমিহীন হচ্ছে, ঈশমের পরিস্থিতি সেটাই প্রমাণ করে। ঈশমের সুখ-শান্তির আশ্রয় ছিল তার প্রিয় তরমুজের খেতের ছই, সেখানে

রাত জেগে সে কল্পনায় ঈশ্বরের লীলা দেখত, অথচ দেশভাগের পর তার সেই আশ্রয় ভেঙে দিয়েছে তারই স্বধর্মের মানুষ হাজিসাহেবের ছেলেরা। সুতরাং সামুর সংগ্রামের ফলে যে খণ্ডিত দেশের উদ্ভব হয়, তা কিছু মধ্যবিত্তের সুবিধাভোগের দেশে পরিণত হয়। সাধারণ মানুষের দুঃখ-দুর্দশা নিরসনের জন্য দেশভাগ হয়নি, একথাই সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে।

অন্যদিকে, ঠাকুর পরিবারের মানুষগুলি তাদের সামাজিক সম্ভ্রম তথা ধর্মরক্ষার জন্য হিন্দুস্থানে চলে যায়। তারা একবারও ঈশমের কথা না ভেবে তাদের সমস্ত জমি বিক্রি করে দেয়, ফলে ঈশম ভূমিহীন হয়। অথচ এই ঈশম শেখ সংকীর্ণ ধর্মবোধের ঊর্ধ্বে উঠে সারাজীবন ঠাকুর পরিবারের মানুষগুলির সেবা করেছে।

মোটকথা, দেশভাগের ফলে মুসলিম রাষ্ট্রের একজন ধর্মপ্রাণ মুসলমান মানুষ ভূমিহীন, আশ্রয়হীন হয়। আবার বিপরীত দিকে ধর্মের টানে হিন্দুস্থান ছেড়ে আসা সফিকুর নামে মুর্শিদাবাদের এক মুসলমান যুবক পূর্ব পাকিস্তানে 'উদ্বাস্তু' পরিচয় পায়। অন্যদিকে, সামসুদ্দিনের পাকিস্তানের স্বপ্নে জল ঢেলে দেয় জিন্নাহ্-সরকার। যে দেশে তখনকার দিনে প্রতি হাজারে মাত্র পঁচিশ জন মানুষ উর্দু ভাষায় কথা বলে, সেখানে উর্দু ভাষাকে 'জিন্নাহ্-সরকার' রাষ্ট্রভাষা হিসাবে ঘোষণা করে। পাকিস্তান সরকারের এই সিদ্ধান্ত সামু মেনে নিতে পারেনি। তার মতে, পূর্ব-পাকিস্তানের ভাষা হবে বাংলাভাষা, যা তাদের পূর্বপুরুষের ভাষা। জিন্নাহ্-সরকারের এই সিদ্ধান্তের ফলে সামুর স্বপ্নভঙ্গ হয়। সামুর জীবন সংগ্রামের গতিপথ পরিবর্তিত হয়। বাঙালি অধ্যুষিত পূর্ব-পাকিস্তানের সরকারি ভাষা উর্দু হয় কীভাবে এই প্রশ্ন সামসুদ্দিনকে দংশন করতে থাকে। শেষ পর্যন্ত সামসুদ্দিন জিন্নাহ্-র সভায় প্রকাশ্যে প্রতিবাদ করে বলে ওঠে যে, উর্দু একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হবে না। এভাবে সরকারের বিরুদ্ধে সামুর নতুন সংগ্রাম শুরু হয়। লেখক যেন বলতে চান, এভাবেই মানুষের সংকট ও সংগ্রামের রূপান্তর ঘটে। সামসুদ্দিনের জীবনেও তাই ঘটে। এতদিন পর্যন্ত সামসুদ্দিনের সংগ্রামের লক্ষ্য ছিল পূর্ববঙ্গের মুসলমানদের জন্য আলাদা রাষ্ট্র পাকিস্তান গঠন করা, আর পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে তার সংগ্রামের মূল লক্ষ্য হল পূর্ব-পাকিস্তানের মানুষের মাতৃভাষার মর্যাদা ফিরিয়ে আনা এবং সেই সঙ্গে এক স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা করা। সামুর এই সিদ্ধান্তের সমর্থনে আরো অনেক মানুষ সমর্থন জানায়। তাই, সামু আর বসে থাকতে পারে না : "তারপর সামু জানে চুপচাপ বসে থাকার সময় আর হাতে নেই। দেশের স্বাধীনতার পর আর এক সংগ্রাম গ্রামে মাঠে আরম্ভ হয়ে গেছে। সে দেখল জিন্নাহ্সাহেব যখন বের হয়ে যাচ্ছেন, তখন চারপাশ থেকে অযুতকণ্ঠে গলা মিলিয়ে কারা যেন

বলছে, না না না। উর্দু পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হবে না।''[৭৯] সামুর এতদিনের সংগ্রামের ফলে ধর্মের ভিত্তিতে দেশভাগ হলেও দেশের মানুষের প্রকৃত স্বাধীনতা আসেনি। তাই, সামুর জীবন সংগ্রামের রূপান্তর ঘটে — ''সামুর মুখের উপর লাইট পোস্টের আলো এসে পড়েছে এতক্ষণে। কিছু বোগেনভেলিয়ার পাতা ডাল মাথার উপর। সেই আলোর ভিতর সে যেন সংগ্রামের অন্য আলোর সন্ধান পেল। সে আবার গ্রামে মাঠে চলে যাবে — বাংলার জনতার রায় নেবে।''[৮০] লেখক এভাবে মানুষের জীবন সংগ্রামের নিরন্তর প্রক্রিয়ার কথা বলেন।

সামসুদ্দিন একদা এমন এক বাংলাদেশের ছবি কল্পনা করেছিল, যেখানে জালালির ক্ষুধার্ত মুখ পেট ভরে খেতে পেলে মনোরম মুখ হয়ে যায়। সামু এইসব ক্ষুধার্ত মানুষের ক্ষুধা নিবারণের জন্য একদা শপথ নিয়েছিল : ''কী নিষ্ঠুর ছিল সেই ক্ষুধার্ত মুখের ছবি। এবং পেট ভরে গেলে জালালির মনোরম মুখ — সে এই বাংলাদেশে এমন সুন্দর মনোরম মুখের ছবি আঁকতে চেয়েছে। পেট ভরে গেলেই মানুষের আর দুঃখ থাকে না। আল্লার দুনিয়ায় বেঁচে থাকতে ভালো লাগে। সে যে একটা শপথ রেখে দিয়েছিল জালালির কবরে, সেই শপথ পত্রটাও যেন কবরের নিচ থেকে উঠে এসে একটা ফেস্টুন হয়ে গেছে।''[৮১] অর্থাৎ স্বপ্নভঙ্গের পর এভাবে সামুর জীবনে নতুন সংগ্রামের শুরু হয়। এবারে সামুর মনে পড়ে ঈশমের কথা, যে দেশভাগের পর তার প্রিয় তরমুজের খেত থেকে বিতাড়িত হয়েছে। সামু ভাবে ঠাকুরবাড়ির মানুষগুলি হয়তো হিন্দুস্থানে গিয়ে নীলকণ্ঠ পাখি খুঁজে পেয়েছে। কিন্তু বাস্তবে তা হয়নি। বাস্তব পরিস্থিতি অন্য কথা বলে। সামসুদ্দিন সেই নতুন পরিস্থিতিতে নতুনতর জীবন সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হয়। লেখক বিবৃতি দেন : ''সামসুদ্দিনের মনে হয়েছিল, তার পাখি আকাশে ওড়ে না, নদীর পাড়ে বসে থাকে। দেশভাগের পরপরই সে ভেবেছিল, তবে বুঝি এবারে সব মিলে গেল — কিন্তু হায়, যত দিন যায় — সে দেখতে পায় সংসারে সবাই পাখিটাকে ছেড়ে দিয়ে বসে থাকে — আবার খুঁজে বেড়ায়। পেলে মনে হয় পাখি মিলে গেছে, দুদিন যেতে না যেতেই মনে হয় পাখিটা আর নীল রঙের নয়, কেমন অন্য রঙ হয়ে গেছে।''[৮২] এভাবে পরিস্ফুট হয়ে ওঠে মানুষের জীবন সংগ্রাম ও জীবন প্রবাহের অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কের কথা।

দেশভাগ পরবর্তী পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করে সামুর ভাবান্তর ঘটে, তার — প্রকৃত চেতনার উদয় হয়। তার মনে হয়, বাঙালি প্রকৃত স্বাধীনতা পায়নি। জিন্নাহ্-সরকারের রাষ্ট্রভাষা বিষয়ক ঘোষণা এবং তরমুজের খেতে ঈশমের মৃত্যু সামুর ভাবনার রূপান্তর ঘটায়। দেশে মানে যে শুধু দেশের মাটি নয়, মানুষের সঙ্গে মানুষের প্রীতি ও সৌহার্দ্যের সম্পর্ক অথবা তা

মাটির সঙ্গে মানুষের আত্মিক সম্পর্ক — এই ভাবনা সামুর অন্তরে আলোড়ন সৃষ্টি করে। দেশ মানে মানুষের সঙ্গে মানুষের প্রীতি ও সৌহার্দ্যের এক অমলিন সম্পর্ক, যে সম্পর্ক তৈরি হয় তিলে তিলে। দেশ মানে মানুষের সামাজিক ও মানসিক পরিমন্ডলও বটে। একটি দেশের মানুষ পৃথিবীর যেখানেই থাক না কেন, সেই মানুষের মন থেকে তার শৈশব-কৈশোরে দেশ মুছে ফেলা যায় না। সামসুদ্দিন তার জাতভাইদের জন্য যেরকম একটি দেশ চেয়েছিল — 'পূর্ব পাকিস্তান' তার সেই কাঙ্ক্ষিত দেশ নয়। বিশেষভাবে, দেশভাগের পর জিন্নাহ্-সরকার যখন উর্দু ভাষাকে পূর্ব-পাকিস্তানেরও সরকারি ভাষা হিসেবে ঘোষণা করে তখন সামুর স্বপ্নভঙ্গ ঘটে। সামুর মনে হয় : "বাংলাদেশ আমাদেরই দেশ, বাংলাভাষা আমাদের বাংলাভাষা, বাংলার জল, বাংলার মাটি আমাদেরই নিকনো ঘরের ছবি, তাকে ফেলে যাব কোথা! তারে ছাইড়া দিলে থাকেডা কি!" [৮৩] সামুর মনে পড়ে, তার দেশ মানে তো শৈশব-কৈশোরের বাংলাদেশ, যা ছিল একদা হিন্দু-মুসলমানের সাংস্কৃতিক মিলনের মহান ক্ষেত্র, যেখানে সামু তার শৈশবে বিসর্জনের পর দুর্গা প্রতিমার খড়্গ নিয়ে মাথায় আমপাতার মুকুট পড়ে রাজা সাজত। সেই দেশের ভাষা বাংলাভাষা, তার সংস্কৃতি বাঙালির সংস্কৃতি এবং সেই দেশে-ই সামুর দেশ। "সামুর মনে হল ওর সেই আম-জামপাতার মুকুট এখনও কে যেন মাথায় তার পড়িয়ে রেখেছে। সে যতই হিন্দু বিদ্বেষের কথা বলুক মাথার আম-জামপাতার মুকুট সে ফেলে দিতে পারেনি। ফেলে দিতে গেলেই দেখেছে ভিতরটা তার হাহাকার করে উঠেছে।" [৮৪] দেশভাগ পরবর্তী পরিস্থিতিতে সামু তার শৈশবের দেশ, মানুষজনের কথা, জালালি, ঈশম, ফকিরসাবের কথা মনে করে উপলব্ধি করে তাকে আরো অনেক পথ হাঁটতে হবে। এবারে তার লক্ষ্য মাতৃভাষার জন্য, বাংলাদেশের জন্য। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে সামু ধর্মীয় বিদ্বেষ ভুলে যায়। বাঙালির প্রাণের দাবি বাংলাভাষার দাবি — এর জন্য সামু সংগ্রামী হয়ে ওঠে।

সামু যেমন তার শৈশবের পাতার মুকুট মাথা থেকে খুলে ফেলতে পারে না, তার মেয়ে ফতিমাও তেমনি শৈশবের সঙ্গী সোনাবাবুর কথা ভুলতে পারে না। সামু দেখছে, সেখানে সোনা বাবু অর্জুন গাছে লিখে রেখে গেছে — "জ্যাঠামশাই আমরা হিন্দুস্থানে চলিয়া গিয়াছি — ইতি সোনা।" [৮৫] সেখানে ফতিমা নীরবে কেঁদে চলেছে। এই দৃশ্য সামুকে অভিভূত করে : "তার মনে হল, এই দেশ বাংলাদেশ। এই দেশে অন্য কোনো জান নেই, ধর্ম নেই, সে মেয়েকে সান্ত্বনা দেবার কোনও ভাষা পেল না। মেয়ের মাথায় হাত রেখে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকল।" [৮৬] সোনাবাবুরা বাংলাদেশ ছেড়ে হিন্দুস্থানে চলে যায়, কিন্তু ঈশম তার তরমুজের খেত ভালোবেসে

সেই তরমুজের খেতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে। মাটির প্রতি মানুষের এই ভালোবাসা সামুকে অভিভূত করে এবং নতুনতর সংগ্রামের জন্য উদ্দীপ্ত করে। ঈশমের কবরে মাটি দেবার পর সামুর মনে হয় : "এই জমির নিচে ঈশম চুপচাপ শুয়ে থাকবে আবহমান কাল। নানারকম ঘাস জন্মাবে কবরে। ফুল ফুটবে ঘাসে। ঈশমের এই কবর থেকেই বাংলাদেশের ছবিটা স্পষ্ট বোঝা যাবে।" [৮৭] ঈশমের এই মৃত্যু সামুর জীবনসংগ্রামের নতুন দিগন্ত খুলে দেয়। পাকিস্তান নয়, এবারে বাংলাদেশের জন্য তার সংগ্রাম : "ঈশমের কবরে সামু এবার নতুন একটা ইস্তাহার লিখে রেখে দিল। ইস্তাহারটার নাম বাংলাদেশ। ... ভূমিহীন অন্নহীন ঈশমের কানে কানে মাটি দেবার আগে বলার ইচ্ছা হল, কিছুই করতে পারিনি এতদিন। স্বাধীনতার মানে বুঝিনি। আপনাকে দেখে মানেটা আমার পরিষ্কার হয়ে গেল।" [৮৮] মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্কের মধ্যেই দেশের আত্মা বিরাজ করে।

ঈশম ঠাকুর পরিবারের মানুষগুলিকে ত্যাগ করেনি, বরং ওরাই ঈশমকে ত্যাগ করে হিন্দুস্থানে চলে গেছে। ঈশম একজন ধর্মপ্রাণ মুসলমান হয়েও হিন্দু পরিবারের মানুষগুলিকে প্রাণাধিক ভালোবাসত। সোনাবাবুরা তরমুজের খেত হাজিসাহেবের ছেলেদের কাছে বিক্রি করে দিতে পারে, কিন্তু ঈশম এই তরমুজের খেতটিকে ভালোবাসে বলেই একরাতে সকলের অলক্ষ্যে সেখানে চলে এসেছিল। "কী এক ভালোবাসা এই জমির জন্য তার সে নিজেও জানে না, বোঝে না কেন এই ভালোবাসা। সে কেন যে আবার তার জমিতে ফিরে এল। ... সে আবার ফিরে এসেছে। তরমুজের পাতার নিচে সে শুয়ে থাকবে। শুয়ে থাকলেই শান্তি। সে শান্তির জন্য পাতা ফাঁক করে উবু হয়ে অন্ধকারে বসল। মাটিতে হাত দিল। থাবড়ে-থাবড়ে সে মাটিটার সঙ্গে কথা বলছে। আবার ফিরা আইলাম মা জননী। তর কাছে ফিরা আইলাম। সে মুঠো মুঠো মাটি তুলে গায়ে মুখে মেখে নিচ্ছে।" [৮৯] — ঈশমের কবরের পাশে দাঁড়িয়ে এই মাটি ও মানুষের প্রতি ঈশমের ভালোবাসার গভীরতাকে সামু এতদিনে উপলব্ধি করতে পারে। সেই উপলব্ধির ফলেই সোনাবাবুদের প্রতি তার তীব্র অভিমান হয়। সামু দেশত্যাগী সোনাবাবুর উদ্দেশে বলে — "সে বেইমান চাচা। আপনাকে ফেলে সে চলে গেছে। লিখে গেছে জ্যাঠামশাই, আমরা হিন্দুস্থানে চলে গেছি। যেন জ্যাঠামশাই ছাড়া তার বাংলাদেশে কেউ নেই।" [৯০] — ধর্মান্ধ সামসুদ্দিন দেশভাগের পর অনুভব করে ঠাকুর পরিবারের মানুষগুলিও তার আত্মার আত্মীয় ছিল। সামু একদিন যাদের হিন্দু বলেই হিংসায় দূরে সরিয়ে দিয়েছে, পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে তার মনে হয় — তাদের ভাষা এক, তাদের জাতি এক, তাদের সংস্কৃতিও অভিন্ন, সুতরাং তারাও আত্মীয়।

ঠাকুর পরিবারের মানুষগুলি হিন্দুস্থানে চলে যাবার পর সামুর অভিমানে এই উপলব্ধির কথা সুস্পষ্ট হয়। সামুর এই ভাবান্তর আসলে তার জীবনান্বেষণেরই রূপান্তর। মানুষের জীবনসংগ্রাম ও জীবনান্বেষণ এক নিরন্তর প্রক্রিয়া। সামসুদ্দিন সেই সংগ্রাম ও অন্বেষণের একজন শরিক। লেখক মানুষের এই নিরন্তর সংগ্রাম ও অন্বেষণের কথা বলার সময় মহাকালের নিষ্ঠুরতার কথাও স্মরণ করেন। তিনি জানেন, মহাকাল মানুষের সব দুঃখ, সব বিবাদ এক সময় গ্রাস করে নেয়। উপন্যাসের শেষে তাই তিনি লেখেন : "তার পর থেকে মাঝে মাঝে আশ্বিনের কুকুর ঈশমের কবরের পাশে ঘোরাফেরা করলে টের পাওয়া যায় মহাবৃক্ষে সেই ক্ষত ক্রমে আবার মিলিয়ে যেতে শুরু করেছে। অর্জুন গাছটা আরও বড় হচ্ছে।" [৯১] — অর্থাৎ লেখক যেন বলতে চান মানুষের জীবনের এত সংগ্রাম, এত উত্থান-পতন — সবই মহাকাল গ্রাস করে নেয়, কারণ প্রবহমানতাই জগৎ ও জীবনের ধর্ম। তিনি আশাবাদী, কারণ জীবনে যতই সংকট আসুক না কেন শেষ পর্যন্ত তা অর্জুন গাছের মতোই ক্রমশ ডালপালা মেলে সবুজ হয়ে উঠতে চায়। এজন্যই তিনি মহাকালের সর্বগ্রাসী ক্ষমতার কথা বলেন : "তবে মহাকাল বড় নিষ্ঠুর। ভেজা প্লেটের মতো তার পিঠে কোনও দাগই আঁকা যায় না। সুনিপুণ কারিগরের মতো সে অতি হালকাভাবে সব মুছে দেয়।" [৯২] অন্যদিকে তিনিই আবার বলেন : "আসলে মহাকালের প্রতিদ্বন্দ্বী নিজেকে ভাবতে ভালোবাসি। মানুষের ধর্মই যে এমন, সে মহাকালকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে বেঁচে থাকতে চায়। বেঁচে থাকতে চায় বলেই কাল কিংবা মহাকাল তাকে কিছুতেই হতাশ করতে পারে না।" [৯৩]

বৃদ্ধ মহেন্দ্রনাথের শতবর্ষ বেঁচে থাকার ইচ্ছা। কিন্তু বৃদ্ধ মহেন্দ্রনাথ জীবনের মায়া ত্যাগ করতে চান না। তিনি বরং বলেন : "আমার তো যাওনের সময় হয় নাই! হইলে টের পামু। তোমাগ ঘণ্টা বাজাইতে হইব না।" [৯৪] বৃদ্ধ বয়সেও জীবনের প্রতি মানুষের মায়া কমে না, মাঠে নেমে যেতে ইচ্ছা হয়। মানুষ আসলে এভাবেই বেঁচে থাকতে চায়। বেঁচে থাকার ইচ্ছা অস্তিত্বের গোপনে সর্বদা জাগ্রত থাকে। ইচ্ছা তাড়িত মানুষের চাওয়া-পাওয়া বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে নানাভাবে রূপান্তরিত হয়। সেই ইচ্ছাগুলিকে মানুষ অমর করে রাখে। মহেন্দ্রনাথের শরীর অশক্ত, কিন্তু তবুও তিনি তাঁর পৌত্রদের সঙ্গে মাঠে নেমে যেতে চান : "আমার মাঠে নাইমা যাইতে ইচ্ছা হয়। তোমরা আমারে মাঠে নিয়া যাইবা?" [৯৫] এই এক ইচ্ছা মানুষকে নিরন্তর সংগ্রামের শরিক করে তোলে। এভাবে মানুষের জীবনসংগ্রাম ও জীবনান্বেষণের ধারা অব্যাহত থাকে। বৃদ্ধ মহেন্দ্রনাথের সূর্যোদয় দেখার বাসনা প্রত্যক্ষ করে সোনাবাবু শৈশবে প্রথম সূর্যোদয়

দেখার আনন্দ অনুভব করে : "সূর্যোদয়ে এত রহস্য আছে সোনার জানা ছিল না। সেও ঠাকুরদাদার দেখাদেখি সূর্যকে প্রণাম করল এবং ঠাকুরদার সঙ্গে গলা মিলিয়ে সূর্যস্তব পাঠ করল।" ৯৬ এভাবে সোনাবাবুর জীবনে আধ্যাত্মিকতার সঞ্চার ঘটে।

মহেন্দ্রনাথ আজীবন সংগ্রাম করেছেন তাঁর মধ্যযুগীয় ধর্মবোধ এবং সমকালীন জীবনের বাস্তবতার সঙ্গে। সোনাবাবু দেশভাগ-সমকালীন সংকটকে শৈশবেই প্রত্যক্ষ করে। শৈশবে 'বান্নি'র মেলা দেখতে এসে সোনাবাবু হিন্দু-মুসলিম সম্প্রদায়ের পারস্পরিক হিংসার রূপকে প্রথমবার প্রত্যক্ষ করে। সোনার শৈশবকাল বাংলার রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের কাল। সোনা প্রত্যক্ষ করে মেলার একটি সামান্য ঘটনাকে কেন্দ্র করে গোটা মেলাটাই যেন ক্ষেপে উঠেছে। সোনা অনুভব করে মেলার দাঙ্গাকে উপলক্ষ্য করে মুসলমান মানুষগুলি যেন তাদের বহুকালের অপমানের প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য ক্ষেপে উঠেছে। সোনা শুধু এইটুকু জানত যে, ঢাকার দাঙ্গায় মালতীর স্বামী কাটা পড়েছে, কিন্তু সেদিন সোনা প্রত্যক্ষ করে দাঙ্গার প্রকৃত রূপ কত ভয়ঙ্কর। এরকম দাঙ্গার মধ্যেই সোনার শৈশব অতিক্রান্ত হতে থাকে। সোনাবাবু প্রত্যক্ষ করে বান্নির মেলাকে কেন্দ্র করে গ্রামের সরলপ্রাণ মানুষগুলি কেমন আনন্দে মেতে ওঠে, আবার মুহূর্তেই তারা সামু ও জব্বরের মত কিছু মৌলবাদী নেতার উস্কানিতে পরস্পরের প্রতি অবিশ্বাসী হয়ে ওঠে। মেলায় দাঙ্গা শুরু হলে ঈশমের মতো ধর্মপ্রাণ মানুষটিও হিন্দু বাবুদের বাড়ির দিকে অগ্রসর হতে ভয় পায়, কারণ সে মুসলমান এবং তার পরিধেয় বস্ত্রটি লুঙ্গি। এভাবে হিন্দু-মুসলমান মানুষেরা পরস্পরের মধ্যে যখন বিভেদ তৈরি করছে, তখন বড় হতে থাকে সোনা, লালটু, পলটু, আবু, ফতিমারা।

সোনার শৈশবকালে বাংলার ঘরে ঘরে মানুষ প্রস্তুত হতে থাকে আসন্ন গৃহযুদ্ধের জন্য। আর সেই সময়ে সোনার কাছে একটি কাঁচপোকা বড় মূল্যবান বস্তু। সে হিন্দু মুসলমানের বিভেদ বোঝে না। ফতিমাকে কাঁচপোকার টিপ পড়াবে বলে সে তার বাক্সে কাঁচপোকা পুরে রেখেছে। শশীমাস্টারের সঙ্গে নৌকা করে স্কুলে যাওয়ার পথে কাঁচপোকা সংগ্রহ করা আর দেশে আসন্ন গৃহযুদ্ধের গল্প শোনা — এর মধ্য দিয়ে সোনার শৈশব অতিক্রান্ত হতে থাকে। এভাবে সোনার জীবনে একদিন গ্রামের সীমানা ছাড়িয়ে দূরদেশে যাওয়ার হাতছানি এল। সোনা মুড়াপাড়ার বাবুদের নৌকায় চড়ে সেখানে দুর্গাপূজা দেখতে যাবে। বাইরের জগতের এই আহ্বানে সোনার মন আনন্দে ভ'রে ওঠে। সোনার তখন বয়ঃসন্ধিকাল, তার শরীরে অস্পষ্ট রেখায় বড় হয়ে ওঠার কিছু চিহ্ন দেখা দিতে শুরু করেছে। সেই সময় থেকে সোনা আর

প্রকাশ্যে তার মায়ের আদর গ্রহণ করতে পারে না, মায়ের কোলে উঠতে লজ্জা পায়। সোনা এভাবে শৈশব থেকে কৈশোরে পদার্পণ করে। মানুষের সত্তার অন্তর্গত যৌনতা কীভাবে তাকে জীবনরহস্যের অপার সমুদ্রের তীরে এনে দাঁড় করিয়ে দেয় সোনার বয়ঃসন্ধির মুহূর্তগুলিই তার প্রমাণ। মুড়াপাড়ার জমিদার বাড়ির দুর্গাপূজায় অমলা কমলার সঙ্গে পরিচয়ের পর থেকেই সোনা স্বপ্ন দেখতে শুরু করে : "সোনা সারারাত ঘুমের ভিতর স্বপ্ন দেখল, সেই এক বড় সমুদ্র যেন, বালিয়াড়িতে কারা একটা বড় কাঠের ঘোড়া টানতে টানতে নিয়ে এলে। কি উঁচু আর লম্বা ঘোড়া! মানুষগুলি চলে গেলেই সে দেখতে পেল, ঘোড়াটা কাঠের নয়, ঘোড়াটা তাজা ঘোড়া — ওর দিকে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাচ্ছে। সে একা ছিল না, কমলা অমলা যেন সঙ্গে আছে।" [৯৭] এভাবে সোনা এক স্বপ্নের দেশের উদ্দেশে রওনা হয়ে যায়। সোনা সে দেশের নাম জানে না, শুধু সে তার স্বপ্নের দেশের মিল খুঁজে পায় অমলার সঙ্গে। সোনা আশ্চর্য এক আলোর রাজ্যে সরল মায়ার টানে ছুটে যেতে থাকে। দুর্গা প্রতিমার সামনে দাঁড়ালে তার মনে হয় তিনি সব টের পেয়ে যাচ্ছেন : "তুমি এক আশ্চর্য মায়ার টানে ছুটে যাচ্ছ সোনা — আমি সব টের পাচ্ছি। সোনা সেজন্য মণ্ডপে দেবীর মুখের দিকে তাকাল না পর্যন্ত। ... সুদূর কলকাতার মতো অমলার শরীরে এক দূরের রহস্য নিমজ্জিত। সোনার বয়স আর কত! তবু এই টান সোনাকে কেমন পাগলের মতো ছুটিয়ে মারছে। সে পাগল জ্যাঠামশাইর কাছ থেকে পালাবার জন্য ডানদিকের বারান্দায় উঠে এল না। সে বড় থামের পাশে নিজেকে প্রথম লুকিয়ে ফেলল। তারপর আবার ছুটে উপরের সিঁড়ি ভাঙতে থাকল।" [৯৮] লেখক যেন বলতে চান এভাবেই মানুষ তার শৈশব থেকেই জীবনান্বেষণের রহস্যময় পথ চলতে শুরু করে।

সোনা অর্থাৎ অতীশ দীপঙ্কর ভৌমিকের জীবনসংগ্রামের প্রথম পদক্ষেপ, শুরু হয় অমলা কমলার হাত ধরে — অর্থাৎ কোনো এক নারী একজন পুরুষকে এভাবে স্বপ্নের রাজ্যে নিয়ে যায়। গ্রামের গণ্ডি পেরিয়ে সোনা শুধু ভিন্ন গ্রামে পদার্পণ করে না, এ যেন তার শৈশবের জগৎ থেকে কৈশোরের স্বপ্নের জগতে উত্তরণ। মুড়াপাড়ার জমিদার বাড়িতে এসে সোনা যে সুদূরের হাতছানি উপলব্ধি করে — সেই রহস্যময় জগতের দূতী হয়ে আসে অমলা কমলা। বারবার কেন যে অমলা কমলাকে দেখার জন্য সোনার মন ব্যাকুল হয়ে ওঠে, তা সে বোঝে না, অথচ যা কিছু মনোরম, যা কিছু সুন্দর, তার সঙ্গে সোনাবাবু এক মেয়ের মুখের আদল খুঁজে পায় — সে মেয়ের নাম অমলা। সোনাবাবুর জীবনে স্বপ্নের দেশের নীলকণ্ঠ পাখি এভাবে উঁকি দিতে থাকে।

লুকোচুরি খেলার ছলে অমলা সোনাকে নিয়ে যায় একটি গোপন স্থানে। সেখানে অমলা সোনাকে তার শরীরের গোপন রহস্যের সন্ধান দেয়। সোনার মনে তখনও সংস্কারের দ্বিধা। কিন্তু অমলার প্রতি এক মায়াবী মোহ — এক অজ্ঞাতপূর্ব আকর্ষণে সোনা শেষ পর্যন্ত অমলার কাছে আত্মসমর্পণ করে। অমলা সোনাকে নিয়ে এক নতুন খেলায় মেতে উঠতে চায়, সোনার কাছে সেই আকর্ষণ অপ্রতিরোধ্য হয়ে ওঠে — "সোনারও কেমন যেন ভালো লেগে যাচ্ছে। সেই হাত নিয়ে খেলা, নতুন খেলা, জীবনের এক অদ্ভুত রহস্যময় খেলা আরম্ভ হয়ে গেল।" [৯৯] এ যেন পাপের দুনিয়ায় আদম ও ইভ্-এর মতই সোনা ও অমলার পদার্পণ। এভাবেই মানুষ স্বপ্নের রাজ্যে পদার্পণ করে এবং একইসঙ্গে পাপের দুনিয়ায়। ছোট্ট সোনার মনে এ নিয়ে যে দ্বন্দ্ব-সংশয়, তা মানুষের জীবনে শৈশব অতিক্রমের মাইলস্টোন। শিশুরা এভাবেই শৈশবের গণ্ডি পেরিয়ে কৈশোরের আলো-আঁধারির জগতের দিকে ছুটে যেতে শুরু করে এবং বাকি জীবন শুধু ছুটতে থাকে — "বেশ একটা খেলা তার জীবনে এসে গেল। এখন তার অমলাকে নিয়ে ছাদের উপর অথবা একটা নীল রঙের মাঠে কেবল ছুটতে ইচ্ছে করছে। ... কী সুন্দর লাগছে অমলাকে, নিত্য নতুন বিচিত্র সব অভিজ্ঞতায় টেনে নিয়ে যাচ্ছে তাকে। কিন্তু মায়ের মুখ মনে পড়তেই সে কেমন বিষণ্ণ হয়ে গেল।" [১০০] মা-এর কথা, জ্যাঠামশাইয়ের কথা মনে পড়াতে সোনা পুনঃপুন দ্বন্দ্বের, ভয়ের মুখোমুখি হতে থাকে। কেবলই তার মনে হয়, এই বুঝি সে সবার কাছে ধরা পড়ে গেল। মা তার মুখ দেখেই যেন বলে দেবে সে পাপের রাজ্যে পদার্পণ করেছে, জ্যাঠামশাই তার গায়ের গন্ধ শুঁকেই যেন বলে দেবে — "সোনা তুমি বড় তরমুজের মাঠ দেখে ফেলেছ। রহস্য তোমার অন্তহীন।" [১০১] সোনা তখন জীবনের বড় মাঠ দেখে ফেলেছে। অমলা নামে এক মানবী তাকে বিচিত্র সব নিত্য নতুন অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে কোথায় যেন টেনে নিয়ে যাচ্ছে। এই গোপন অভিসারের জন্য সোনার মনে পাপবোধ হয় — কিন্তু কী এক দুর্বার আকর্ষণে সে নিজেকে ভাসিয়ে দেয়। সে আর নিজেকে ফেরাতে পারে না। সোনা ভাবে, সে নদীর জলের কাছে তার সব পাপের কথা বলে দেবে, আবার ভাবে সে তার মাকে অথবা জ্যাঠামশাইকে সব পাপের কথা বলবে। কিন্তু কী করবে সোনা! সে যতই মায়ের কাছে ফিরে যাবার কথা ভাবুক না কেন, সেখানে সে ফিরে যেতে পারছে না, অর্থাৎ সে আর তার শৈশবে ফিরে যেতে পারছে না, জ্যাঠামশাইকেও এ পাপকথা বলা যায় না। জীবনের এই প্রবহমানতার বিপরীতে সে যেতে পারে না। এই পাপের ভিতর দিয়েই তাকে সাঁতার কেটে যেতে হবে। নদীর জলকে সাক্ষী রেখেও সোনা তার মহাপাপের কথা বলতে পারে না —

"এখন মনে হচ্ছে খালেক মিঞার মতো সে পথ হারিয়ে ফেলেছে। এই কুয়াশা পার হলেই এক জগৎ, সেখানে নিয়ে যাবার জন্য অমলা তার সুন্দর চোখ নিয়ে অপলক প্রতীক্ষা করছে।" [১০২] লেখক যেন বলতে চান, এভাবেই এক নারী সোনাবাবুর হাত ধরে তাকে জীবনসংগ্রামের বিশাল মাঠে নেমে যাওয়ার আহ্বান করে। এভাবেই কোনো না কোনো লক্ষ্যের দিকে মানুষের জীবনের পথ চলা শুরু হয়। সোনা তার শৈশবে ফিরতে না পারার দুঃখ ভুলে যায়। চলমানতাই জীবন। তাই নদীর ঘাটে জীবনের প্রবহমানতার ছবি দেখে সে তার মনের সব পাপ-কথা ভুলে যায়। নদীর ঘাটের নিত্যদিনের ছবি, স্টিমার নৌকা এবং প্রতীক্ষারত যাত্রীদের দেখতে দেখতে সোনাও যেন একটি নৌকার মাঝি হয়ে যায় — "এই নাও ভাসাইয়া দিছে সোনা, অমলা অথবা কমলা অথবা ফতিমারে নিয়া সোনাবাবু মাঝগাঙের মাঝি হইয়া গেছে।" [১০৩] এই সময় পাগল মানুষ মণীন্দ্রনাথ দার্শনিকের মতো সোনার মাথায় হাত রেখে বলে — "... তোমার ভিতর বীজের উন্মেষ হচ্ছে সোনা। এই হতে হতে কিছু সময় পার হলে তুমি কিশোর হয়ে যাবে। তখন দেখবে রহস্যটা যা এখন ছুঁতে পারছ না, তা ধরতে পারবে। আরও বড় হলে, দুই কুলের নাই কিনারা, তুমি জলের ভিতর ডুবে যাবে। না ডুবতে পারলে পাড়ে-পাড়ে তার সন্ধানে থাকবে। তারপর খুঁজে না পেলে আমার মতো পাগল হয়ে যাবে।" [১০৪] এই পাগল মানুষের দৃষ্টিতে (প্রকারান্তরে সর্বজ্ঞ লেখকের) জীবন এমনই এক অনুসন্ধানের নিরন্তর ক্রিয়া। এই অন্বেষণ ক্রিয়ার ভিতর মানুষ ডুবে যায় অথবা ডুবতে না পারলে সে নিরন্তর অন্বেষণে নিযুক্ত থাকে। লেখক সোনার জীবন-পরিক্রমার শৈশব ও কৈশোরের সন্ধিকালটুকুতে সেই রহস্যের উন্মোচন ঘটিয়েছেন।

সোনা, অমলা, ফতিমার জীবন পরিক্রমা কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। লেখকের দৃষ্টিতে এদের জীবনসংগ্রাম ও জীবনান্বেষণের সূচনা আসলে মহাজীবনের প্রবহমানতারই অবিচ্ছেদ্য অংশ। কলকাতার মেয়ে অমলার কথা মনে পড়াতেই সোনা কোনো এক রাজার দেশে চলে যায়। সোনা কলকাতাকে এক নতুন সাম্রাজ্যের মতো নতুন করে আবিষ্কার করে। সোনা সেই সাম্রাজ্যের রাজপুত্র হতে চলেছে, রাজপুত্রের মতো সে ঘোড়ায় চড়ে, পিছনে তার অমলা। ঘোড়ার পিঠে চড়েই সে যেন তার জ্যাঠামশাইয়ের হারিয়ে যাওয়া নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে বেরিয়ে পড়ে।

আবার, ঘোড়ার গাড়িতে বসে মণীন্দ্রনাথেরও কেবলই পলিনের কথা মনে পড়ে, কেননা অমলাকে তার ছোট্ট পলিন মনে হয়। সোনাকে ছোট অমলার পাশে দেখে জ্যাঠামশাইয়ের সেই

স্মৃতির জাগরণ ঘটে। মণীন্দ্রনাথ প্রত্যক্ষ করেন যে, তাঁর জীবনে ভালোবাসা পূর্ণতা না পেলেও, সেই ভালোবাসা এ পৃথিবী থেকে হারিয়ে যায়নি। অমলা, সোনা — এদের মধ্যে মানুষের ভালোবাসার সেই প্রবাহ অম্লান থেকে যায়। লেখক দেখিয়েছেন, একদা মণীন্দ্রনাথ পলিনের চোখের মায়া আর হাতের যাদুতে প্রশ্রয় পেয়েছিলেন, কালক্রমে পলিন যেন অমলার রূপ নিয়েছে আর সোনা যেন তারই দোসর।

অমলা যখন একদিন সোনাকে চিঠিতে জানিয়েছে যে, তারা মুড়াপাড়া থেকে কলকাতায় চলে যাচ্ছে, তখন সোনার মুখ বিবর্ণ হয়ে যায়, তার ভিতরটা হাহাকার করে ওঠে — "তার মনে হল নদীর চর আর কাশের বনে বনে কেবল কে যেন আজ চুরি করে বুকের মধ্যে ফ্লুট বাজাচ্ছে।" [১০৫] প্রকৃতপক্ষে, সুখ, স্বপ্ন, আনন্দ যেমন জীবনের অংশ তেমনি যন্ত্রণা, বিষাদ আর স্বপ্নভঙ্গও জীবনেরই অন্যরূপ। আশাভঙ্গের বেদনাও ব্যক্তিক জীবনকে গড়ে তোলে, জীবনসত্যের কঠিন রূপ জীবনসংগ্রামের রসদ জোগায় — এই সত্যটি অতীন বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর উপন্যাসে দেখান।

সোনার শৈশব অতিবাহিত থাকে দেশভাগ-পূর্বকালীন উত্তাল রাজনৈতিক তরঙ্গমালার মধ্য দিয়ে। সোনা তার শৈশবেই প্রত্যক্ষ করে রঞ্জিত দেশোদ্ধারের জন্য গুপ্ত-সমিতির সদস্যপদ নিয়েছে। রঞ্জিত দেশমাতৃকার জন্য যেন নিবেদিত-প্রাণ-সৈনিক। শশীমাস্টার স্বদেশীভাবাপন্ন। এই দেশ তার কাছে মহান, যারা দেশের স্বাধীনতার জন্য জেলে যায় তারা মহৎ মানুষ। সোনা দেখছে জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য তার কাকা শচীন্দ্রনাথকে পুলিশ ধরে নিয়ে যায়। সোনা সেজন্য কান্নাকাটি করলে শশীমাস্টার সোনাকে এই বলে প্রবোধ দেয় যে, যারা দেশের জন্য জেলে যায় তারা প্রভূত সম্মানের অধিকারী, তার জন্য কাঁদতে নেই। সোনা শশীমাস্টারের কথায় এক স্বাধীন দেশের স্বপ্নে বিভোর হয়ে যায়। সোনার মনে হয়েছিল দেশ স্বাধীন হলে হয়তো সত্যিই গরিব মানুষের আর কোনো দুঃখ থাকবে না। তার আরও মনে হয়েছে, তার ঠাকুরদা কিছুদিন বেঁচে থাকলে স্বাধীন দেশ দেখে যেতে পারবে, ছোট্ট সোনা স্বাধীন দেশের নাগরিক হবে, ভাবতেই সোনার মন আনন্দে ভরে উঠেছিল। ব্যক্তি মানুষ এভাবেই এক একটি রাজনৈতিক পরিমণ্ডলের মধ্যে বড় হয়। তাদের স্বপ্ন ও স্বপ্নভঙ্গ ঘটাও রাজনৈতিক তরঙ্গের উত্থান পতনের সঙ্গে সঙ্গে নিয়ন্ত্রিত হয়। সোনার জীবনপ্রবাহেও তার ব্যতিক্রম ঘটে না।

সোনার শৈশবেই দেশের পরিস্থিতি ক্রমশ জটিল হয়ে ওঠে। রঞ্জিত হাডসন সাহেব

নামক এক ইংরেজ কর্মচারীকে হত্যার দায়ে পলাতক, শচীন্দ্রনাথকে পুলিশে ধরে নিয়ে যাবার জন্য চারিদিকে জনতা একত্রিত হয়ে 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনি দিতে থাকে। অন্যদিকে সামুর নেতৃত্বে মুসলিম লীগের ছত্রছায়ায় মুসলমান মানুষগুলি একত্রিত হতে থাকে। দেশের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট দ্রুত পরিবর্তিত হতে থাকে। এরই মাঝে সোনা বড় হয়ে উঠতে থাকে। এভাবে রাজনৈতিক চিত্র অঙ্কনের মধ্য দিয়ে লেখক দেখান ব্যক্তি মানুষ কীভাবে জীবনের সঙ্গে সেইসব অভিজ্ঞতাকে ধারণ করে জীবনের প্রবহমানতাকে বজায় রাখে। স্বাধীনতা-পূর্ব বাংলাদেশ যখন রাজনৈতিক তরঙ্গে উত্তাল তখন সোনার বয়ঃসন্ধিকাল। সোনার ভিতর তখন অজানা পাপের রহস্যময় খেলা শুরু হয়ে যায়। সোনা অমলার একটি চিঠির জন্য তখন উদ্বেল হয়ে ওঠে। অর্থাৎ রাজনৈতিক উত্তেজনার দিনেও জীবন এগিয়ে চলে। অমলার একটি নীল খামের চিঠিতে সোনা নীলকণ্ঠ পাখির চোখ দেখতে পায়। এই নীলকণ্ঠ পাখি মানুষের জীবনে যেন এক সোনার হরিণ, কিছুতেই সে ধরা দেয় না। সোনার জেঠামশাই সেই নীলকণ্ঠ পাখি খুঁজতে গিয়ে পাগল হয়ে গেছেন, অমলার মাও র‍্যামপার্টে নীল রঙের একটা পাখি খোঁজেন। সোনার বয়ঃসন্ধিতে সেই নীলকণ্ঠ পাখির অন্বেষণ শুরু হয়ে যায়। অমলা নামে এক বালিকা সোনাকে সেই নীলকণ্ঠ পাখির সন্ধান দিয়েছে।

উপনয়নের সময় পুরোহিতের মন্ত্রোচ্চারণ শুনে, ধর্মীয় আচার পালনের মধ্য দিয়ে সোনা জীবনের নতুন স্বাদ ও বর্ণের সম্মুখীন হয়েছে।

ধীরে ধীরে সোনা জীবনের গোপন রহস্যগুলির সন্ধান পেতে থাকে। পর পর কিছু ঘটনার মধ্য দিয়ে লেখক সোনার বড় হয়ে ওঠার পর্বগুলিকে দেখিয়েছেন। সোনা প্রথমবার বাড়ির বাইরে মুড়াপাড়ার জমিদার বাড়িতে গিয়ে অমলার সংস্পর্শে জীবনের রহস্যময়তার সন্ধান পায়। এক নারী তাকে শৈশব থেকে কৈশোরে টেনে নিয়ে যেতে চায়। উপনয়নের সময় সোনার কতগুলি নতুন অভিজ্ঞতা হয়। ধর্মীয় আচারসংক্রান্ত এইসব অভিজ্ঞতা সোনার মনে নানা প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। তারপর বর্ষার জলে ভেসে আসা বোয়াল মাছের ডিম পাড়া দেখে সে জীবের জন্ম রহস্য জেনে যায়। তার কাছে পৃথিবীর এক নতুন রহস্যের উন্মোচন ঘটে : "সোনা খালি হাতে উঠে যাচ্ছে। সে এত সামনে এমন পীরের বোয়াল পেয়েও ধরল না। কেমন এক অন্য পৃথিবী তার রহস্য খুলে ধরছে। যত ধরছে তত সে সোনা থাকছে না, অতীশ দীপঙ্কর হয়ে যাচ্ছে। সে ফতিমার খোঁজে তাড়াতাড়ি মোত্রা ঘাসের জঙ্গলে ঢুকে গেল। দেখল ফতিমা নেই। তার মনটা খুব খারাপ হয়ে গেল।" [১০৬] এভাবেই মানুষ বড় হয়, সোনা বড় হয়ে

ওঠে। জগতের সৃষ্টির রহস্য খুলে যায় সোনার জীবনে। মাছের জন্ম রহস্য দেখার পর তাই সোনা ফতিমাকে খোঁজে, সোনার মনের আকাশে তখন অমলা ভেসে বেরায়, যেন এভাবেই মানুষের ভিতরে সুপ্ত আদম ইভ্-কে খুঁজে বেরায়। এসবের মধ্য দিয়ে অতীন বন্দ্যোপাধ্যায় সোনাকে গড়ে তুলেছেন। জীবনের এই শাশ্বত নিয়মের ধারায় শুধু সোনা নয়, আমরা সবাই যেন আমাদের বড় হয়ে ওঠার আলো-আঁধারিকে প্রত্যক্ষ করি।

অতীন বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর উপন্যাসে মানবজীবনের অপরাজেয়তাকেই বড় করে দেখিয়েছেন। অবশ্য এই অপরাজেয়তার অর্থ তার কাছে এই নয় যে, সে সবসময় জয়লাভ করে, এই অপরাজেয়তার অর্থ হল, মানুষ প্রতিকূল পরিস্থিতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে হেরে গেলেও হার মানতে চায় না। এই হার না মানা মানসিকতাই অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাসের চরিত্রগুলিকে অমরত্ব দান করেছে। আমরা দেখি, হেরে যাওয়া মানুষ মণীন্দ্রনাথ পাগল হয়ে গিয়েও আজীবন পলিনের ভালোবাসা খুঁজেছেন, শেষপর্যন্ত নিজের জীবনের অপ্রাপ্তিকে ভ্রাতুষ্পুত্র সোনার মধ্যে পূরণ করে নেওয়ার কথা ভেবেছেন। বৃদ্ধ মহেন্দ্রনাথ আর এক হেরে যাওয়া মানুষ, কিন্তু তিনিও জীবন থেকে পালাতে চাননি। ফেলু তার জীবনের শেষ রক্তবিন্দু থাকা পর্যন্ত সংগ্রাম করে মৃত্যুবরণ করে। ঈশম মৃত্যুর মধ্য দিয়ে দেখিয়ে দিয়ে যায় — দেশ ও মাটির প্রতি ভালোবাসার গূঢ় অর্থ কী। মালতী সারাজীবন লাঞ্ছনা সহ্য করেও বেঁচে থাকতে চায়, এমনকি ইজ্জতের বিনিময়েও জীবনকেই সে বড় করে দেখেছে। স্বপ্নভঙ্গের পরও সামসুদ্দিন অপ্রতিরোধ্য, সে আরও এক নতুন সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হয়। দেশভাগের পর তার সংগ্রাম শুরু হয় মাতৃভাষার জন্য, স্বাধীন বাংলাদেশের জন্য।

সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার পরিপ্রেক্ষিতে দেশভাগ যখন প্রায় অবশ্যম্ভাবী — সেই প্রেক্ষাপটেও লেখক তাই দুই বিপরীত ধর্মের দুটি কিশোর-কিশোরীর নিষ্পাপ ভালোবাসার চিত্র অঙ্কন করেছেন। কট্টর হিন্দু পরিবারের সন্তান সোনা এবং মুসলিম লীগের নেতা সামুর কন্যা ফতিমা পাগল ঠাকুর মণীন্দ্রনাথকে খুঁজতে বেরিয়ে পরস্পরের এত ঘনিষ্ঠ হয়ে যায় যে, মনেই হয় না তারা দুটি ভিন্ন ধর্মের মানুষ। দেশে তখন সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি প্রায় শূন্যের পর্যায়ে — "ওরা দুজন এত কাছাকাছি আর কী সুন্দর উভয়ের চোখ — এখন মনেই হয় না যাবতীয় পৃথিবীতে কোনও গণ্ডগোল আছে।"[১০৭] সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার দিনেও বৃষ্টিতে ভিজে ভিজে ওরা এমন একজন মানুষকে খুঁজছে, যিনি এক সময় নীলকণ্ঠ পাখি খুঁজে খুঁজে শেষে পাগল হয়ে গেছেন। এভাবে যখন দুটি ভিন্ন ধর্মের কিশোর-কিশোরী ভালোবাসার জন্য পাগল হয়ে যাওয়া একটি

মানুষকে খুঁজে বেরাতে থাকে, তখন শশীভূষণ খবরের কাগজ পড়ে সকল মানুষকে দেশভাগের সম্ভাবনার কথা শোনাচ্ছিলেন। দেশভাগের সম্ভাবনা যখন কার্যকরী হতে চলেছে, বাংলার অসংখ্য মানুষ যখন অশিক্ষা, কুসংস্কার এবং দারিদ্র্য-কবলিত, সেই সময়ে বড় হয়ে উঠছে সোনা, লালটু পলটু, ফতিমা, আবু — এই নতুন প্রজন্ম। দেশভাগের হয়ে গেলে এই নতুন প্রজন্মের মানুষগুলিরও স্বপ্নভঙ্গ ঘটে।

প্রেক্ষাপটের দিক থেকে 'নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে' আসলে দেশভাগের সমকালীন পটভূমিতে রচিত একটি কালজয়ী উপন্যাস। উপন্যাসে ১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সময়ের রাজনৈতিক পরিবর্তনের উত্তাল সময়টিকে ধরা হয়েছে। এই সময়ের রাজনৈতিক ঝড় ব্যক্তি মানুষের জীবনসংগ্রাম ও জীবনান্বেষণকে কোনো না কোনোভাবে প্রভাবিত করেছে। কিন্তু লেখকের অন্বিষ্ট হল মানব-জীবনের প্রবহমান ধারাকে নানাভাবে উপলব্ধি করা। তাই উপন্যাসে তিনি দেখিয়েছেন, রাজনৈতিক তরঙ্গমালা মানুষের জীবনকে নানাভাবে আন্দোলিত করে কিন্তু জীবনপ্রবাহ অপ্রতিরোধ্য ব্যাপার। জীবনপ্রবাহ অপ্রতিরোধ্য বলেই মানুষের জীবনসংগ্রাম ও জীবনান্বেষণ হয়ে ওঠে এক নিরন্তর ক্রিয়া। উপন্যাসে তিনি দেখিয়েছেন, শান্ত নিরিবিলি গ্রাম একসময় সাম্প্রদায়িক উন্মাদনায় আক্রান্ত হয়, সম্প্রীতির মন্ত্র ভুলে ধর্মের ভিত্তিতে দেশভাগ হয়। দাঙ্গার পরিপ্রেক্ষিতে দেশের মানুষ ভাবে দেশভাগ হলেই সব সমস্যার সমাধান হবে। কিন্তু উপন্যাসে লেখক দেখিয়েছেন সুদীর্ঘ সংগ্রামের শেষে দেশভাগের পরও কোনও মানুষই তার কাঙিক্ষত লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারে না। দেশভাগের পর তাদের জীবনে নতুন করে সংকট রচিত হয়, মানুষের জীবন আবার বিপন্ন হয়ে ওঠে।

দেশভাগের পর বাঙালির জীবনে শুরু হয় ভিন্নতর সংগ্রাম। সামসুদ্দিনের লক্ষ্য ছিল পৃথক মুসলিম রাষ্ট্র গঠনের মধ্য দিয়ে গরিব দুঃখী মুসলমান মানুষগুলির মান-সম্ভ্রম ফিরিয়ে দেওয়া। দেশভাগের পর সামসুদ্দিনের সেই স্বপ্ন ব্যর্থ হয়ে যায়। সামসুদ্দিন মাতৃভাষার জন্য এবং স্বাধীন বাংলাদেশের জন্য নতুন করে সংগ্রাম শুরু করে। পশ্চিমবঙ্গ থেকে পূর্ববঙ্গে গিয়ে উদ্বাস্তু যুবক সফিকুর ভাষা আন্দোলনের শহিদ হয়ে যায়। সামসুদ্দিনের কন্যা ফতিমা সফিকুরের এই মৃত্যুতে নির্বাক হয়ে যায়। ফতিমা ভালোবাসত সফিকুরকে। ফতিমার এই স্বপ্নভঙ্গের বেদনা সামসুদ্দিনও অনুভব করে। সামসুদ্দিন তার মেয়েকে সান্ত্বনা দেবার কোনো ভাষা খুঁজে পায় না। তার মনে পড়ে এক ডাক্তার বন্ধুর কথা। সেই ডাক্তার বন্ধু তাকে বলেছে : "তুমি ওকে কোথাও নিয়ে যাও! পার তো দেশে নিয়ে যাও। সেখানে গেলে ওর শৈশবের কথা

মনে হবে। মনে হলে বুঝাতে পারবে, কিছুই থেমে থাকে না। এভাবেই মাটি মানুষ এবং নদী বয়ে যায়। শৈশবের ভিতর ফিরে গেলে মানুষের শোক-দুঃখ অনেকাংশে লাঘব হয়।" [১০৮] জীবনের এই অপ্রতিরোধ্য গতির কথাই অতীন বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর উপন্যাসে বার বার বলেন।

দেশভাগের পর অন্যান্যদের মতো সোনারও স্বপ্ন ভেঙে গেছে। সোনাকে তার শশীমাস্টার এক স্বাধীন দেশের স্বপ্ন দেখিয়েছিল। সোনা সেই স্বাধীন দেশের নাগরিক হবে, ভাবতেই তার মন পুলকিত হয়েছিল। স্বাধীনতার পর সোনা স্বচক্ষে তাদের বাড়ি-ঘর ভাঙা দেখেছে। তারপর সে তার পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে হিন্দুস্থানে চলে এসেছিল। হিন্দুস্থানে এসেই সোনার স্বপ্নভঙ্গ ঘটেছে : "চার বছরে সে আর আগের সোনা নেই, অন্য সোনা হয়ে গেছে। সেই যে সে ভেবেছিল, এই দেশে এসেই ওরা সবাই রাজার মতো হয়ে যাবে, কত সমারোহ থাকবে জীবনে, দেশভাগের নিমিত্ত ওরা শহিদ হয়ে গেছে — সুতরাং সর্বত্র ওদের জন্য বিজয় পতাকা উড়বে। ওরা রাজার মতো হেঁটে হেঁটে শহর নগর পার হয়ে যাবে।" [১০৯] কিন্তু বাস্তবে তা হয়নি। বাস্তবে কলকাতা শহরে সোনার পক্ষে ঠাঁই পাওয়া দুঃসাধ্য ব্যাপার। দেশভাগের পর সোনার জীবনে চার বছর কেটে গেছে। এই চার বছরে তাদের একান্নবর্তী পরিবার ভেঙে ছত্রখান হয়েছে। তার কাকা তাদের ছেড়ে অন্যত্র চলে গেছেন। তার মেজ জ্যাঠা, পিতা চন্দ্রনাথ হিন্দুস্থানে এসে নতুন করে বাঁচার জন্য সংগ্রামে লিপ্ত হয়েছে। দেখা যায়, হিন্দুস্থানে আবার নতুন করে মাটিতে শেকড় সেঁধিয়ে দেওয়ার জন্য ভূপেন্দ্রনাথ শেষ বয়সে শুধু গাছের চারা রোপণ করছেন। দেশভাগের পর একটি উদ্বাস্তু পরিবার আবার কীভাবে মাটির সঙ্গে নিবিড় সম্পর্ক স্থাপন করার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করছে — উপন্যাসের শেষে লেখক তার চিত্র অঙ্কন করেছেন। লেখক এই উদ্বাস্তু পরিবারের পুনরায় শেকড় খোঁজার চিত্রটি অঙ্কন করে বুঝিয়ে দিয়েছেন, মানুষের জীবনসংগ্রাম এক নিরন্তর ক্রিয়া। কিছুই থেমে থাকে না। মানুষ স্বপ্ন দেখে, স্বপ্নের পিছনে ধাবিত হয়, স্বপ্ন ভেঙে গেলে সে আবার নতুন করে স্বপ্ন দেখে — মানুষের জীবনপ্রবাহ এভাবেই অগ্রসর হয় — মানুষের জীবনসংগ্রাম অব্যাহত থাকে।

দেশভাগের চার বছর পর যখন সোনার স্বপ্নভঙ্গ হয়, তখন সোনাও থেমে থাকে না। সোনা একদা তাদের যৌথ পরিবারে সকলের আশ্রয়ে বেড়ে উঠেছিল। তাকে কখনও জীবিকার সন্ধান করতে হয়নি, অথচ দেশভাগের পর সোনা অজানা-অচেনা কলকাতা শহরে এসেছিল জীবিকার সন্ধানে। জীবিকার জন্য নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ পরিবারের সন্তান সোনা জাহাজি হওয়ার ট্রেনিং নিতে কলকাতায় এসেছে। সেখানে কেউ তাকে চেনে না। অথচ সে একদিন ভেবেছিল

যে, এদেশে তারা রাজার সম্মান পাবে। বাসে যেতে যেতে সোনা নিজেকে প্রশ্ন করে : "কেমন আছো রাজা? ভালো আছো? শীত করছে খুব? খুব খিদে পেয়েছে? কাল রাত থেকে কিছু খাওনি?" [১১০] এত কষ্টের পরও সোনা থেমে যায় না। সোনা আশা প্রকাশ করে — "আর বেশী দেরি নেই। যেখানে যাচ্ছি দেখবে কত কিছু খেতে পাবে তুমি। কোন কষ্ট থাকবে না তোমার।" [১১১] — এই আশাবাদ মানুষকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়। আসলে জীবন সম্পর্কে লেখক দারুণ আশাবাদী। তাঁর এই উপন্যাসে জীবন সম্পর্কে এই আশাবাদের কথাই ধ্বনিত হয়েছে। আশা আছে বলেই মানুষ সমূহ বিপর্যয়ের পরও স্বপ্ন দেখে — স্বপ্ন দেখে বলেই মানুষ এগিয়ে যায় — তার জীবনসংগ্রাম অব্যাহত থাকে। উদ্বাস্তু পরিবারের সন্তান সোনা তার পরিবারের মানুষগুলির দুঃখ দারিদ্র্য দূর করার জন্য জাহাজি হতে চায়। জাহাজি ট্রেনিং-এ এসে সোনাকে শুনতে হয় যে, জাহাজি হতে গেলে তাকে 'বিফ্' খেতে হবে, নইলে জাহাজি হওয়া নয়। এই পরিস্থিতিতে সোনার পূর্ব পুরুষের দ্বারা বাহিত সংস্কার ও ধর্মীয় পরিমণ্ডল ভেঙে যাওয়ার উপক্রম হয়। কিন্তু সোনা তখন অভুক্ত, তাকে বেঁচে থাকতে হবে। শেষ পর্যন্ত তার কাছে ভেড়ার মাংস ও 'বিফ্' সবই একাকার হয়ে যায়। সোনার কাছে তখন বেঁচে থাকাই বড় কথা। এদেশে আসার পর তার বাবা বহুদিন বাদে বাদে তাদের কাছে আসেন। তিনি এলেই তার ভাইবোনদের মুখে অন্ন ওঠে। তার মা অন্নহীন। শেষ পর্যন্ত পরিবারের এইসব নিরন্ন মানুষের কথা মনে করে সে 'বিফ্' খাওয়ার কথা স্বীকার করে নেয়। কারণ বেঁচে থাকাই সবচেয়ে বড় কথা — পরিবর্তিত পারিস্থিতিতে বেঁচে থাকার জন্য ট্রেনিং অফিসার তাঁর পূর্বপুরুষের ধর্মীয় সংস্কারকে কবেই ছুঁড়ে ফেলেছেন — "তিনি যেন এখন বলতে যাচ্ছেন, আমার পিতা অঘোর চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, পিতামহের নাম হরিবিলাস চট্টোপাধ্যায়, তস্য পিতামহের নাম যদুনাথ চট্টোপাধ্যায়।" [১১২] সোনার জীবনের উত্তরণের বিন্দুতে লেখক যেন জানিয়ে দিতে চান, ধর্ম বড় নয়, জীবন বড়, জীবনের জন্য ধর্মীয় সংস্কারকে ভেঙেও মানুষের জীবনপ্রবাহের ধারা অব্যাহত থাকে। সোনার এই জীবনপ্রবাহ, এই মানসিক উত্তরণ নির্দ্বন্দ্ব নয়, মানসিক দ্বন্দ্বে ও বেদনায় ক্ষতবিক্ষত হয়ে সোনা জীবনপ্রবাহের শরিক হয়েছে। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে সোনা উপলব্ধি করে যে, সে তার পূর্বপুরুষের দ্বারা বাহিত ধর্ম এবং ধর্মীয় সংস্কারকে ধরে রাখতে পারবে না, তা করতে গেলে তার অস্তিত্বই বিপন্ন হবে। তাই, অস্তিত্বের সংকটকে বিপন্ন সোনা শেষ পর্যন্ত তার যাবতীয় পূর্ব-সংস্কার ভাঙতে প্রস্তুত হয়। সোনা প্রথমে ভাবে : "বিফ্! আমি বিফ্ খাব কেন! আমি হিন্দুর ছেলে, হিন্দুস্থানে চলে এসেছি। আমি আবার বিফ্ খাব কেন! যারা

পাকিস্তানে আছে তারা বিফ্ খাবে।" [১১৩] ... তারপর সোনাকে তার সেই সংস্কারকে ভেঙে ফেলতেই হয়, কেননা তার মা, ভাই-বোন সবাই অভুক্ত, তাদের জন্য তাকে অন্নসংস্থান করতে হবে। এভাবে সোনা দ্বিধা-দ্বন্দ্বে ক্ষতবিক্ষত হয়ে জীবনের প্রবহমানতাকে স্বীকার করে নেয়।

প্রকৃতপক্ষে, 'নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে' উপন্যাসে লেখক এক বিশাল ক্যানভাসে যে চরিত্রগুলিকে অঙ্কন করেছেন সেই চরিত্রগুলির মধ্য দিয়ে তিনি দেশভাগের সমকালীন রাজনৈতিক ও আর্থসামাজিক পরিস্থিতিতে মানুষের নিরন্তর জীবনসংগ্রাম ও জীবনান্বেষণের কথাই বলেন। মহাকালের ধারায় প্রবহমান জীবনকে তিনি দেশভাগের সমকালীন প্রেক্ষাপটে কালোত্তীর্ণ রূপদান করেছেন। 'নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে' উপন্যাসের পরবর্তী সিরিজ 'অলৌকিক জলযান'। 'ঈশ্বরের বাগান' উপন্যাসেও আমরা জীবনের এই প্রবহমানতা তথা মানুষের জীবনসংগ্রাম ও জীবনান্বেষণের নিরন্তর ক্রিয়ার কথা জানতে পারব। তাঁর দেশভাগ-পরবর্তীকালীন উদ্বাস্তু সমস্যাকেন্দ্রিক উপন্যাস 'মানুষের ঘরবাড়ি'-তেও মানুষের জীবনসংগ্রাম ও জীবনান্বেষণের নিরন্তর ক্রিয়ারই ভিন্ন রূপের পরিচয় পাব।

উল্লেখসূচি

১) হীরেন চট্টোপাধ্যায় (সম্পাদিত) : 'অতীন বন্দ্যোপাধ্যায় উপন্যাস সমগ্র', তৃতীয় খণ্ড, করুণা প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ - ২০০৬ খ্রিস্টাব্দ, ভূমিকা।

২) কল্যাণ মৈত্র : 'অতীন বন্দ্যোপাধ্যায় এক অকথিত জীবন ও দর্শন নিয়ে আলাপচারিতায়', 'আমার সময়', প্রথম বর্ষ, ষষ্ঠ সংখ্যা, ডিসেম্বর ২০০৯ খ্রিস্টাব্দ, পৃষ্ঠা - ১৪।

৩) লাডলী মোহন রায় চৌধুরী : 'ক্ষমতা হস্তান্তর ও দেশবিভাগ', দে'জ পাবলিশিং, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ১৯৯৯ খ্রিস্টাব্দ, দ্বিতীয় সংস্করণ জানুয়ারি ২০০৪ খ্রিস্টাব্দ, পৃষ্ঠা - ১৫।

৪) সুকুমার সেন : 'ভারত বিভাগ : স্বপ্নভঙ্গের ইতিহাস', ভাষা ও সাহিত্য, প্রথম প্রকাশ ১৯৯৯ খ্রিস্টাব্দ, পৃষ্ঠা - ১৭।

৫) কল্যাণ মৈত্র : 'অতীন বন্দ্যোপাধ্যায় এক অকথিত জীবন ও দর্শন নিয়ে আলাপচারিতায়', 'আমার সময়', প্রথম বর্ষ, ষষ্ঠ সংখ্যা, ডিসেম্বর ২০০৯ খ্রিস্টাব্দ, পৃষ্ঠা - ১৪।

৬) তদেব, পৃষ্ঠা - ১৪-১৫।

৭) অতীন বন্দ্যোপাধ্যায় : 'না লিখে পারি না'; সুভাষ মুখোপাধ্যায় (সম্পাদিত) : 'কেন লিখি', মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, জানুয়ারি ২০০০ খ্রিস্টাব্দ, পৃষ্ঠা - ১৩৭।

৮) অতীন বন্দ্যোপাধ্যায় : 'না লিখে পারি না'; সুভাষ মুখোপাধ্যায় (সম্পাদিত) : 'কেন লিখি', মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, জানুয়ারি ২০০০ খ্রিস্টাব্দ, পৃষ্ঠা - ১৩৬-১৩৭।

৯) কল্যাণ মৈত্র : 'অতীন বন্দ্যোপাধ্যায় এক অকথিত জীবন ও দর্শন নিয়ে আলাপচারিতায়', প্রথম বর্ষ, ষষ্ঠ সংখ্যা, ডিসেম্বর ২০০৯ খ্রিস্টাব্দ, পৃষ্ঠা - ১৪।

১০) বিমল কর : 'আমি ও আমার তরুণ লেখক বন্ধুরা', করুণা প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ আশ্বিন ১৩৯২ বঙ্গাব্দ, পৃষ্ঠা - ৭৬।

১১) অতীন বন্দ্যোপাধ্যায় : 'নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে', করুণা প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ এপ্রিল ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দ, পঞ্চম অখণ্ড সংস্করণ জানুয়ারি ২০০২ খ্রিস্টাব্দ, পৃষ্ঠা - ৯।

১২) তদেব, পৃষ্ঠা - ৯

১৩) তদেব, পৃষ্ঠা - ১১

১৪) তদেব, পৃষ্ঠা - ১১

১৫) তদেব, পৃষ্ঠা - ৩২০

১৬) তদেব, পৃষ্ঠা - ৩৭

১৭) তদেব, পৃষ্ঠা - ১৬

১৮) তদেব, পৃষ্ঠা - ১৬

১৯) তদেব, পৃষ্ঠা - ২৪

২০) তদেব, পৃষ্ঠা - ২৯৩

২১) তদেব, পৃষ্ঠা - ২৯৩

২২) তদেব, পৃষ্ঠা - ৩০৬-৩০৭
২৩) তদেব, পৃষ্ঠা - ৩১৫
২৪) তদেব, পৃষ্ঠা - ৩১৫
২৫) তদেব, পৃষ্ঠা - ৩১৫
২৬) তদেব, পৃষ্ঠা - ৩১৬
২৭) তদেব, পৃষ্ঠা - ৩২৪
২৮) তদেব, পৃষ্ঠা - ৩২৫
২৯) তদেব, পৃষ্ঠা - ৩২৭
৩০) তদেব, পৃষ্ঠা - ৩৫৫
৩১) তদেব, পৃষ্ঠা - ৩৫১
৩২) তদেব, পৃষ্ঠা - ২০
৩৩) তদেব, পৃষ্ঠা - ২০
৩৪) তদেব, পৃষ্ঠা - ২১
৩৫) তদেব, পৃষ্ঠা - ২১
৩৬) তদেব, পৃষ্ঠা - ২১
৩৭) তদেব, পৃষ্ঠা - ২৭
৩৮) তদেব, পৃষ্ঠা - ৪৭
৩৯) তদেব, পৃষ্ঠা - ৪৮
৪০) তদেব, পৃষ্ঠা - ২০১
৪১) তদেব, পৃষ্ঠা - ২০২
৪২) তদেব, পৃষ্ঠা - ২০৩
৪৩) তদেব, পৃষ্ঠা - ২০৭
৪৪) তদেব, পৃষ্ঠা - ৪১
৪৫) তদেব, পৃষ্ঠা - ৭২
৪৬) তদেব, পৃষ্ঠা - ৭৩
৪৭) তদেব, পৃষ্ঠা - ৭৪
৪৮) তদেব, পৃষ্ঠা - ৭৭
৪৯) তদেব, পৃষ্ঠা - ২৩
৫০) তদেব, পৃষ্ঠা - ২৯
৫১) তদেব, পৃষ্ঠা - ৩০
৫২) তদেব, পৃষ্ঠা - ৩০
৫৩) তদেব, পৃষ্ঠা - ১২৫
৫৪) তদেব, পৃষ্ঠা - ১২৫

৫৫) তদেব, পৃষ্ঠা - ২০১
৫৬) তদেব, পৃষ্ঠা - ২২৮
৫৭) তদেব, পৃষ্ঠা - ২৩১
৫৮) তদেব, পৃষ্ঠা - ২৩৩
৫৯) তদেব, পৃষ্ঠা - ২৩৩
৬০) তদেব, পৃষ্ঠা - ২৪০
৬১) তদেব, পৃষ্ঠা - ২৪১
৬২) তদেব, পৃষ্ঠা - ২৪১
৬৩) তদেব, পৃষ্ঠা - ২৪৩
৬৪) তদেব, পৃষ্ঠা - ২৪৪
৬৫) তদেব, পৃষ্ঠা - ২৪৪
৬৬) তদেব, পৃষ্ঠা - ২৪৪
৬৭) তদেব, পৃষ্ঠা - ২৪৪
৬৮) তদেব, পৃষ্ঠা - ৩৯৫
৬৯) তদেব, পৃষ্ঠা - ১৩০
৭০) তদেব, পৃষ্ঠা - ৩৮
৭১) তদেব, পৃষ্ঠা - ২৫২
৭২) তদেব, পৃষ্ঠা - ২৫২
৭৩) তদেব, পৃষ্ঠা - ২৫২
৭৪) তদেব, পৃষ্ঠা - ৩৩-৩৪
৭৫) তদেব, পৃষ্ঠা - ৩১
৭৬) তদেব, পৃষ্ঠা - ১৯
৭৭) তদেব, পৃষ্ঠা - ২৫০
৭৮) তদেব, পৃষ্ঠা - ৩৭৯-৮০
৭৯) তদেব, পৃষ্ঠা - ৩৮৪
৮০) তদেব, পৃষ্ঠা - ৩৮৪
৮১) তদেব, পৃষ্ঠা - ৪০৬
৮২) তদেব, পৃষ্ঠা - ৪০৭
৮৩) তদেব, পৃষ্ঠা - ৪০৭
৮৪) তদেব, পৃষ্ঠা - ৪০৭
৮৫) তদেব, পৃষ্ঠা - ৪১২
৮৬) তদেব, পৃষ্ঠা - ৪১২
৮৭) তদেব, পৃষ্ঠা - ৪১২

৮৮) তদেব, পৃষ্ঠা - ৪১২
৮৯) তদেব, পৃষ্ঠা - ৪০৯
৯০) তদেব, পৃষ্ঠা - ৪১২
৯১) তদেব, পৃষ্ঠা - ৪১২
৯২) অতীন বন্দ্যোপাধ্যায় : 'না লিখে পারি না'; সুভাষ মুখোপাধ্যায় (সম্পাদিত) : 'কেন লিখি', মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, ২০০০ খ্রিস্টাব্দ, পৃষ্ঠা - ১৩৭।
৯৩) তদেব, পৃষ্ঠা - ১৩৭
৯৪) অতীন বন্দ্যোপাধ্যায় : 'নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে', করুণা প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ এপ্রিল ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দ, পঞ্চম অখণ্ড সংস্করণ জানুয়ারি ২০০২ খ্রিস্টাব্দ, পৃষ্ঠা - ১৩৪।
৯৫) তদেব, পৃষ্ঠা - ১৩৪
৯৬) তদেব, পৃষ্ঠা - ১৩৪
৯৭) তদেব, পৃষ্ঠা - ১৭১
৯৮) তদেব, পৃষ্ঠা - ১৮৬
৯৯) তদেব, পৃষ্ঠা - ১৮৯
১০০) তদেব, পৃষ্ঠা - ১৮৯
১০১) তদেব, পৃষ্ঠা - ১৯০
১০২) তদেব, পৃষ্ঠা - ১৯১
১০৩) তদেব, পৃষ্ঠা - ১৯২
১০৪) তদেব, পৃষ্ঠা - ১৯২
১০৫) তদেব, পৃষ্ঠা - ২২৩
১০৬) তদেব, পৃষ্ঠা - ২৮৯
১০৭) তদেব, পৃষ্ঠা - ৩৭২
১০৮) তদেব, পৃষ্ঠা - ৪১১
১০৯) তদেব, পৃষ্ঠা - ৪০০
১১০) তদেব, পৃষ্ঠা - ৪০০
১১১) তদেব, পৃষ্ঠা - ৪০০
১১২) তদেব, পৃষ্ঠা - ৪০৬
১১৩) তদেব, পৃষ্ঠা - ৪০৫